
আনন্দমেলা
১২ মার্চ ১৯৮০
১
আনন্দবাজার-প্রকাশন



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি দিয়েছেন - শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, সোমনাথ দাসগুপ্ত

স্ক্যান করেছেন - সঙ্ঘমিত্রা সরকার

এডিট করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার স্পেশাল ইস্যু থাকে
এবং আপনি যদি আমাদের সাথে সেগুলি সংরক্ষণে সাহায্য করতে চান
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com


এখন আপনার দীঘল চুলে আনুন
অনন্য সৌন্দর্যের বাহার!
পণ্ডস্ পরিষ্কার! পণ্ডস্ সুন্দর!
আপনার চুল যে রকমেরই হোক তার জন্যে
রয়েছে পণ্ডস্-এর এই সব সৌরভে ভরা
শ্যাম্পু— বিউটি, এগ, টনিক, লেমন।
পণ্ডস্ শ্যাম্পুর দেদার ফেনায়
দীঘল চুলের সব প্রয়োজন মেটায়
POND'S
Beauty Shampoo
For normal hair
পণ্ডস্

আনন্দমেলা

২৮ ফাল্গুন ১৩৮৬ • ১২ মার্চ ১৯৮০ • ৫ বর্ষ • ২১ সংখ্যা

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

ঠিক যেন জ্যান্ত মানুষ

শেখর বসু

আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন অতীতের বিখ্যাত সব মানুষরা। ওই তো মহারানী ভিক্টোরিয়া, ওই তো গান্ধীজী, ওই তো পাবলো পিকাসো। গা শিরশির করে উঠল আমার। প্রত্যেকেরই চোখ আমার দিকে। যে-কেউ যে-কোনো মুহূর্তে কথা বলে উঠতে পারেন।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কেউই কিছু বললেন না। বলবেনই বা কী করে? সবাই যে মোমের তৈরি। লন্ডনের মাদাম ত্যুসো'জ-এ পা দেওয়ার অনেক আগে থেকেই এইসব মোমের পুতুলের কথা জানতাম। কিন্তু জানতাম না, জানা আর দেখার মধ্যে এত



রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ও রানী আলেকজান্দ্রার মূর্তি

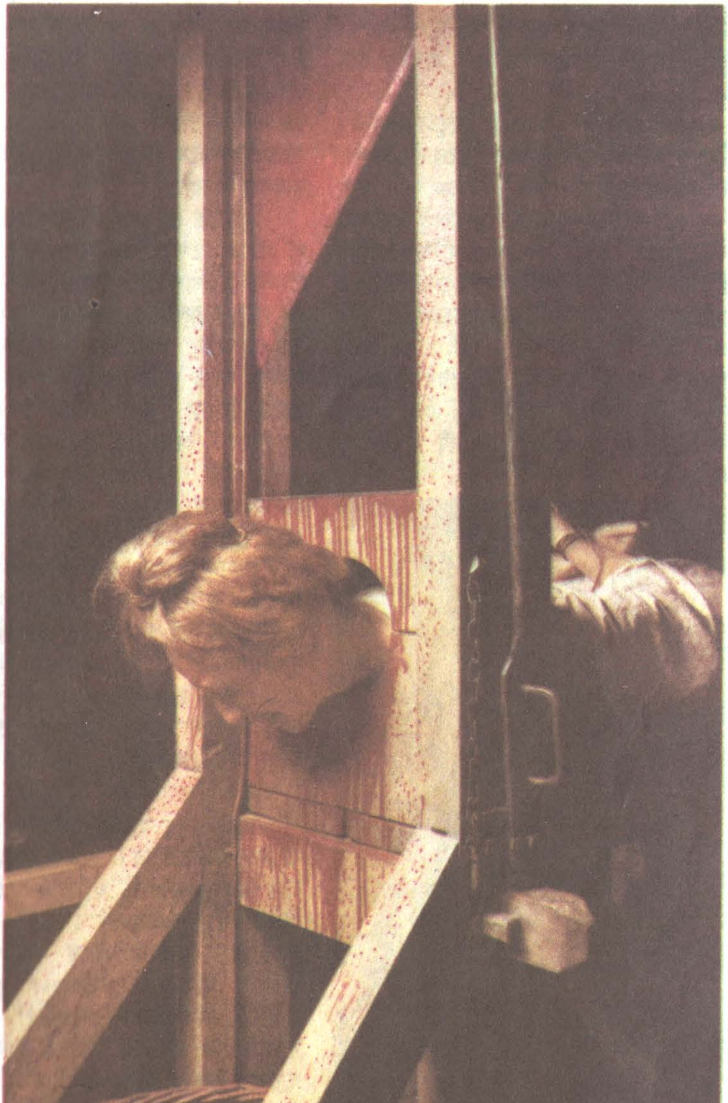
তফাত হবে! মূর্তিগুলো বোধহয় জ্যান্ত মানুষের চেয়েও বেশি জ্যান্ত।

লন্ডনের বেকার স্ট্রীট আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনের পাশেই মাদাম ত্যুসো'জ। ঝলমলে বিশাল বাড়িটি দেখে আন্দাজ করা শক্ত যে, এর মধ্যে একটি স্বপ্নের দেশ লুকিয়ে আছে। এক পাউন্ড ৭০ পেন্সের একটা টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকেই চমকে উঠেছিলাম আমি। সত্যিকারের পোশাক-আশাক-পরা মানুষ-গুলোকে দেখে কে বলবে যে এরা পুতুল!

এদের যিনি বানিয়েছেন তাঁর নাম মাদাম



সত্যিকারের ইউনিফর্মে মোমের জেনারেল দ্য গল



গিলোটিনে মাথা কাটা যাচ্ছে মোমের আসামীর

ত্যুসো। তিনি কিন্তু আজকের মানুষ নন। তাঁর জন্ম আজ থেকে দুশো বছরেরও আগে। তাঁর নামেই প্রদর্শনীর নাম—মাদাম ত্যুসো'জ।

মাদাম ত্যুসোর মোমের পুতুল গড়ার হাতেখড়ি প্যারিসে, কাকার কাছে। অল্প-দিনের মধ্যেই মূর্তি গড়ার কাজে তাঁর খুব সুনাম হয়। ষোড়শ লুইয়ের বোন মাদাম এলিজাবেথকে তিনি কিছুকাল মূর্তি তৈরির কাজ শিখিয়েছিলেন। কাকা মারা গেলে কাকার মোমের মূর্তিগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর হাতে আসে। তিনি ত্রিশটি মূর্তি সঙ্গে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে চলে আসেন বরাবরের জন্যে। তারপর প্রায় সারা জীবন ধরে এক শহর থেকে আর-এক শহরে প্রদর্শনী দেখিয়ে বেড়ালেন।



ঠিক যেন আসল হিচকক! ফোটো অলক মিত্র

প্রদর্শনী চালাবার ফাঁকে-ফাঁকে মূর্তি বানাতেন তিনি। বয়েস বাড়লেও তাঁর উৎসাহে ভাটা পড়েনি কখনও। সত্তর বছর বয়েসে ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় এক বছরে তিনি সাতটি শো দেখিয়েছেন। ১৮৩৫ সালে লণ্ডনে পাকাপাকিভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন।

নিখুঁত প্রতিমূর্তি বানাবার জন্যে তাঁর পরিশ্রমের শেষ ছিল না। মূর্তির উপযোগী পোশাক, উপযুক্ত পরিবেশ-নির্মাণ এবং সঠিক আলোর ব্যবস্থা করার জন্যে তিনি টাকা-পয়সা খরচা করতেন দু'হাতে। ফ্রান্সের রাজার মাথা কাটা গিয়েছিল যে গিলোটিনের ব্লেডে, কিংবা চতুর্থ জর্জ যে-পোশাক পরে রাজপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন, সেই ব্লেড এবং সেই পোশাক যোগাড় করার জন্যে মাদাম ত্যুসো যে-অর্থ ও পরিশ্রম দিয়েছিলেন, তার তুলনা নেই।

মাদাম ত্যুসো গত হয়েছেন বহুকাল। কিন্তু তাঁর তৈরি প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা এখনও মূর্তি গড়ে চলেছেন সমানে। মাদাম ত্যুসো'জ-এ সব মূর্তি এক জায়গায় নেই। এক-একটি ঘরে এক-এক ধরনের মূর্তি। প্রতিটি বিভাগের আলাদা-আলাদা নাম। যেমন দ্য ট্যাবলো, দ্য কনজারভেটরি, হিরোজ, দ্য চেম্বার অব হররস ইত্যাদি।

ভিক্টোরীয় যুগের ইংলণ্ড জীবন্ত হয়ে উঠেছে ট্যাবলোতে। কয়েক মাস আগে এই ঘরে নতুন কয়েকটি মূর্তিও এসেছে। যেমন, 'কুইন মেরির বিনাশ'। ঐতিহাসিক এই দৃশ্যটির কাছেই আছে আধা-ঐতিহাসিক একটি ঘটনার প্রতিরূপ। 'তুমি তোমার বাবাকে শেষ কবে দেখেছ?'—এই নামের দৃশ্যটি ১৬৪২-৪৬ সালের ইংল্যাণ্ডের গৃহ-যুদ্ধের একটি করুণ দৃশ্যকে মুহূর্তে চোখের সামনে নিয়ে আসে। রাজবাড়ির সঙ্গে যুক্ত একটি পরিবারের জবানবন্দী নিচ্ছেন কঠিন মুখের বিচারকরা। টেবিলের সামনে পাঁচ-ছ' বছরের একটি ছেলে। ওই প্রশ্নটি করা হয়েছে তাকেই। ছেলেটির পেছনে তার সাত-আট বছরের দিদি কাঁদছে, পাশে প্রহরী। পুরো দৃশ্যটি পুরনো ইংল্যাণ্ডের পোশাক ও পট-ভূমিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ব্রন্টি বোনেদের ছবি আঁকছে ব্রনওয়েল--অসামান্য

এই দৃশ্যটিও নতুন।

১৯৭৫ সালে তৈরি 'কনজারভেটরি' বিভাগে এই শতাব্দীর বিচিত্র সব ব্যক্তিত্ব জায়গা পেয়েছে একসঙ্গে। আসল পামগাছের আশেপাশে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে আছে লেখক, গায়ক, খেলোয়াড়, রাজনীতিবিদ, অভিনেত্রী, জকি কিংবা বাগানের মালির মূর্তি।

'গ্রান্ড হল'-এ পৃথিবীর ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসেছেন বিখ্যাত সব ব্যক্তিরা। আছেন প্রথম এলিজাবেথ, আছেন ছয় বউ নিয়ে অষ্টম হেনরি। অনেকের মধ্যে আছেন মহারানী ভিক্টোরিয়া, জন কেনেডি, স্যার উইনস্টন চার্চিল, চার্লস দ্য গল, রাজা হুসেন এবং পাবলো পিকাসো। হলের মাঝামাঝি জায়গায় কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়ে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন গান্ধীজী। ১৯৭৬ সালে বানানো এডিনবার্গের ডিউকের মূর্তিও আছে এখানে।

'হিরোজ'-এ হিরোদের ভিড়। কেউ-কেউ এই বিভাগটির নাম দিয়েছেন মাদাম ত্যুসোর থিয়েটার ওয়ার্কশপ। এখানে জনপ্রিয় ব্যক্তিরা অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে বেরিয়ে আসেন হঠাৎ। শব্দ ও আলোর কারসাজিতে মনে হয়, মোমের মূর্তিগুলি চলাফেরা করছে। মহাকাশচারী আর্মস্ট্রং, অলড্রিন, মুষ্টিযোদ্ধা মহম্মদ আলি প্রমুখ আছেন এখানে।

'চেমবার অব হররস' কুখ্যাত সব মানুষের মূর্তিতে ঠাসা। গোবেচারা চেহারার ক্রিস্টিকে দেখে বোঝা শক্ত যে, এই লোকটাই বেশ কয়েকটি মেয়েকে খুন করে রান্নাঘরের আলমারিতে লুকিয়ে রেখেছিল। ন'টি লোককে খুন করেছিল হেগ। কুখ্যাত মানুষদের মধ্যে আছে বার্ক আর হেয়ার। এরা নিরীহ মানুষদের মেরে ফেলে মৃতদেহ বিক্রি করত এডিনবার্গ মেডিক্যাল অ্যাকাডেমিতে।

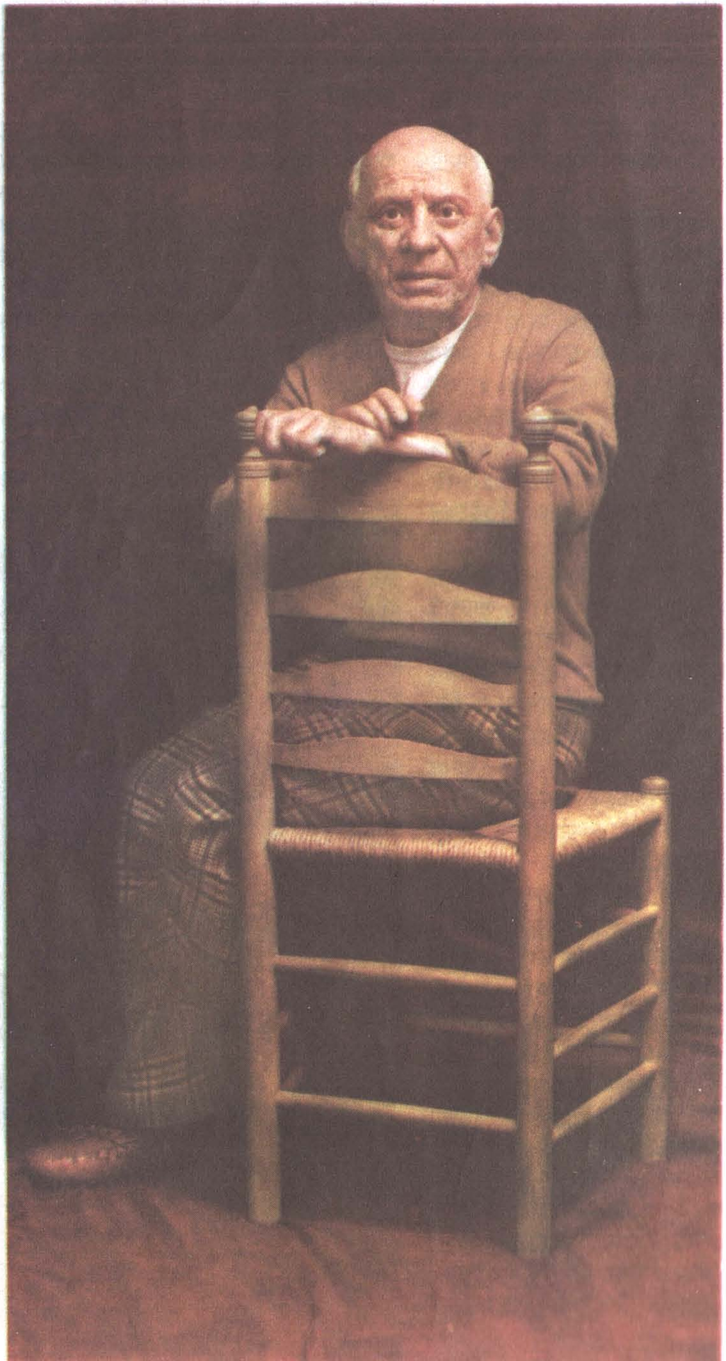
ট্রাফালগারের যুদ্ধের দৃশ্যটি আলো, শব্দ ও ধোঁয়ার সাহায্যে নিপুণভাবে দেখানো হয়েছে একটি হলে। ঐতিহাসিক সেই জাহাজের নীচের 'গান ডেক'টি যেন তুলে আনা হয়েছে এখানে। প্রায় চল্লিশজন সেনা চারটি কামান থেকে গোলা ছুঁড়ছে। ওদিকে, আহত নেলসন জয় নিশ্চিত জেনে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছেন।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে মাদাম ত্যুসো'জ-এর মূর্তিগুলি পালটে দেওয়া হয়। তবে কোনো মূর্তিই নষ্ট করা হয় না, সব সযত্নে রেখে দেওয়া হয় সমারসেটের উকি হোলের স্টোররুমে।

মূর্তি গড়ার অনেকগুলি ভাগ আছে। প্রথমে ঠিক করা হয়, কার মূর্তি গড়া হবে। সেই মানুষটি যদি জীবিত থাকেন, মাদাম ত্যুসো'জ-এর শিল্পী গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার নেন। তাঁর আকৃতির সমস্ত খুঁটিনাটি সংগ্রহ করা হয়। মাপজোক নেওয়া হয় শরীরের। চুল, চোখ এবং পোশাকের বৈশিষ্ট্য স্টাডি করার পরে নানাদিক থেকে অসংখ্য ফোটোগ্রাফ তোলা হয়। মৃত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আকৃতি-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য, জীবনী এবং ছবি সংগ্রহ করার পরে কাজে নামেন শিল্পীরা। এক-একটা নিখুঁত মূর্তি গড়তে



মাদাম ত্যুসোর প্রতিমূর্তি ফোটো অলক মিত্র



মোমের পাবলো পিকাসো

সময় লেগে যায় বিস্তর।

বিখ্যাত ব্যক্তিরাও বহুক্ষেত্রে শিল্পীদের যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। চার্চিলের মতো ব্যস্ত মানুষ দু' দুবার 'সীটিং' দিয়েছেন শান্ত হয়ে। একবার তাঁর বিয়ের সময় —১৯০৮-এ আর একবার ১৯৫২ সালে। এডিনবার্গের ডিউক বাকিংহাম প্যালেসে শিল্পীদের সামনে হাজিরা দিয়েছেন দিনের পর দিন।

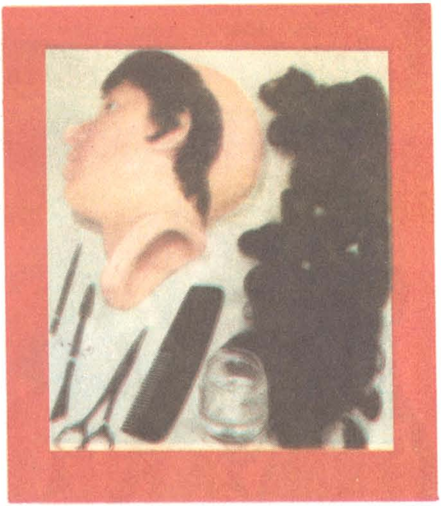
অনেকেই নিজেদের মূর্তিকে নিখুঁত করার জন্যে নিজেদের পোশাকের একটি সম্পূর্ণ সেট উপহার দিয়েছেন মাদাম ত্যুসো'জ-এ। মার্শাল টিটো এবং জেনারেল আইসেনআওয়ার দিয়েছেন নিজেদের ইউনিফর্ম। হেনরি মুর পুরো পোশাকের সঙ্গে রুমাল পর্যন্ত দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান দিয়েছেন টাই।

শুধু বিখ্যাত নয়, কুখ্যাত ব্যক্তিদের অনেকেও সহযোগিতা করেছে মাদাম ত্যুসো'জ-এর সঙ্গে। হেগ নামের যে লোকটা ন'টা খুন করার পরে ধরা পড়েছিল, সে তার মূর্তির জন্যে নিজের সাধের সবুজ হপস্যাক স্যুট, সবুজ মোজা আর লাল টাই উপহার দিয়ে গেছে।

১৯৬৫ সালে ইংল্যান্ড থেকে মৃত্যুদণ্ড উঠে যায়। ইংল্যান্ডের শেষ জল্লাদের নাম হ্যারি অ্যালেন। অ্যালেন প্রায় ৩৬ জনকে ফাঁসি দিয়েছিল, আর একশো জনকে ফাঁসি দেওয়ার কাজে সাহায্য করেছিল। সেই অ্যালেনও তার মূর্তির জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছিল নিজের এক সেট পোশাক।

মাদাম ত্যুসো'জ-এর শিল্পীরা ভীষণ যত্ন নিয়ে প্রতিটি মূর্তি বানান। পোশাক-আশাকও করা হয় নিখুঁত। কিন্তু মাঝেমধ্যে বিখ্যাত ব্যক্তিরা নিজেদের মূর্তি দেখতে এসে সামান্য কিছু ভুলচুকও ধরে ফেলেন। একবার ফীল্ড মার্শাল মন্টগোমারি নিজের মূর্তিটি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখার পরে বলেছিলেন, "আরে! আমার আর-একটা মেডাল রিবন কোথায় গেল?" লর্ড মাউন্টব্যাটেন দেখতে পেয়েছিলেন যে, তাঁর বিখ্যাত কাকা সপ্তম এডওয়ার্ডের জুতোর একটা কাঁটা উলটো করে বসানো।

এরকম ভুল ধরার ঘটনা অবশ্য খুব কম।



মোমের মূর্তির মাথায় একটি-একটি করে চুল বসানো হচ্ছে

অধিকাংশ মূর্তিই নিখুঁত। আলফ্রেড হিচকক একবার লন্ডনে একটি ছবির শ্যুটিং করার সময় তাঁর এক ভক্তকে বলেছিলেন, "আমাকে বারবার ওভাবে দেখবেন না। ভাল করে যদি দেখতে চান মাদাম ত্যুসো'জ-এ চলে যান, সেখানে আমার মূর্তি আছে।"

কথাটা কিন্তু একটুও মিথ্যে নয়। হিচককের মোমের মূর্তিটি দেখলে মনে হয়, সত্যিকারের হিচকক দাঁড়িয়ে আছেন।



মুখে জল-রঙ ধরাবার পরে মেক-আপ



ফোটো তোলা

কবিতা সিংহ

“দীপা, মিস্ রায় তোমাকে ডাকছেন!”

মিস রায়ের নাম শুনেই দীপার ভুরু কুঁচকে গেল। আড়মোড়া ভেঙে বলল, “উঃ, আজ ফাইনাল ডেতেও নিষ্কৃতি নেই!”

রুবু ঠোঁট উলটে বলল, “বুড়ির স্বভাব-টাই অমনি। কবে যে বুড়ির হাত থেকে মুক্তি পাব?”

রুবুর বলার ভঙ্গিতে আশপাশের ছেলেমেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়ল।

রিনা খুব ভয়ে ভয়ে ছিল। ওর ইউনি-ফর্মের একটা কোণ ইস্ত্রি করতে গিয়ে সামান্য বেরঙা হয়ে গেছে। তাই রিনা মিস রায়ের শ্যেনদৃষ্টি থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। একবার যদি মিস্ রায়ের চোখে পড়ে যায় তাহলেই গাল খেতে খেতে প্রাণ যাবে। স্কুলের নিয়ম না মেনে বুড়ি মাঝে মাঝে চড়টা চাপড়টাও লাগিয়ে দেয়। যাকগে, মিস্ রায় এ-যাত্রা রিনাকে ডাকেননি। ডেকেছেন দীপাকে। কারণ দীপাই খেলাধুলোয় সবচেয়ে ভাল। বুড়ির নামে কমপ্লেন করেও ফল হয় না। হেডমিসট্রেস ইত্যাদি ওঁর ছাত্রী ছিলেন বলে ওঁর সম্বন্ধে কোনো অভিযোগই শোনেন না। স্টেডিয়ামের সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় বসে বসে রিনা মনের আনন্দে গোল সবুজ মাঠ আর স্টেডিয়ামের অন্য-অন্য গ্যালারি দেখতে লাগল।

ইণ্টার-স্কুল স্পোর্টস কম্পিটিশন। গ্যালারিতে গ্যালারিতে ইউনিফর্ম পরা গুচ্ছ-গুচ্ছ ছেলেমেয়েদের উঁচু থেকে আর দূর থেকে মনে হচ্ছে গুচ্ছ-গুচ্ছ মৌসুমী ফুল। নানারকম রঙের তোড়া-তোড়া ফুল যেন। লাল নীল হলুদ সবুজ কমলা ধানি বেগুনি মেরুন। ওদের স্কুলের ইউনি-



ফর্মের রঙটি অবশ্য সবচেয়ে সুন্দর। উজ্জ্বল গোলাপি। ওদের দলটিকে দূর থেকে নিশ্চয়ই গোলাপের একটি গুচ্ছের মতো লাগছে।

ওপরে নীল আকাশ। শীতের মনোরম দুপুর। রোদের রঙ সোনালি। মাঝে মাঝে চিনচিনে হাওয়া দিচ্ছে।

রিনা দেখল, দীপাকে কীসব বোঝাতে বোঝাতে মিস্ রায় ওদের গ্যালারির দিকেই আসছেন। সত্যিকথা বলতে কী, মিস্ রায়কে রিনার একটুও ভাল লাগে না। মোটা-সোটা টিস-কুমড়ো গড়ন। কলার দেওয়া ফুলহাতা জামার সঙ্গে কেমন অদ্ভুত কেতায় শাড়ি পরেন পিন-আপ করে। পাতা কেটে গুটি খোঁপা বাঁধেন কাঁচা-পাকা চুলে। খুব মোটা কাচের চশমা পরেন। কালোকোলো গোল মুখ। আর ভুরু কুঁচকে ধমক দিয়ে ছাড়া কথা বলেন না। প্রেয়ারের সময় দেরিতে এলে করিডোরে দাঁড় করিয়ে রাখেন, পি টির সময় ভুল করলে, ক্লাসে যেতে আসতে লাইন বাঁকা করলে, সকলের মাঝখানে চেঁচিয়ে বকেন। কেডসে রঙ না করলে, ময়লা পাটভাঙা ইউনিফর্ম পরলে, বাড়িতে চিঠি যায়।

এই নতুন স্কুলে এসে রিনার সব ভাল লেগেছিল কেবল এই মিস্ রায়কে ছাড়া।

আগের স্কুলের স্পোর্টস টীচার বুলবুলিদি যেমনি কমবয়সি আর তেমনি স্মার্ট। আর কী হাসিখুশি। রিনা আগের স্কুলে স্পোর্টসে ফার্স্ট-সেকেন্ড হত। দীপারা সেই কথা মিস রায়কে বলার পর মিস রায় যেন আরও চটে গিয়েছেন রিনার ওপর। মাস ড্রিলের ফিগার করাতে করাতে কথায় কথায় কেবল বলেন : কিচ্ছু পার না। এই বুঝি ফার্স্ট গার্লের নমুনা। জেদের বশে বাড়িতে আয়নার সামনে ফিগার প্র্যাকটিস করেও রিনা বুড়িকে খুশি করতে পারেনি। আজ স্পোর্টস কম্পিটিশনে আসার পথেও সারা বাস বুড়ি

গজর-গজর করেছে। আগের মেয়েরা কত ভাল ছিল। কত সিনসিয়ার ছিল। স্কুল তখন কত প্রাইজ পেত। কত ট্রফি জিতত। এখন সবাই ফাঁকি দেয়। মন দিয়ে স্পোর্টস করে না। স্কুলের মান রাখার দিকে কারও চোখ নেই। মন নেই।

মিস্ রায় এগিয়ে আসতেই রিনারা উঠে দাঁড়াল। ঘাড় দেখে উনি খনখনে গলায় বললেন, "যাও তাড়াতাড়ি যাও, এক্ষুনি স্পোর্টস শুরু হবে। আগের বছরের ট্রফিটা দেখো এ বছর যেন হাতছাড়া না হয়।"

অপ্রসন্ন মুখে রিনা নেমে যাচ্ছিল। বুড়ি বলল, "এই যে ফার্স্ট গার্ল, মাস ড্রিলের ফিগারগুলো যেন ভাল করে কোরো।"

বিকেলের রাঙা আলোয় রিনাদের ছোট্ট দলটার অনেকগুলো ছবি উঠল। এবারের কম্পিটিশনের বেশির ভাগ প্রাইজই ওরা পেয়েছে। ট্রফিও। প্রায় প্রত্যেকের হাতেই প্রাইজ। হাসি আর ধরে না ওদের মুখে। অন্য-অন্য স্কুলের ছেলেমেয়েরা ওদের অভিনন্দন জানিয়ে গেল। প্রধান অতিথি, সভাপতি সবাই-ই খুব খুশি।

কিন্তু, মিস্ রায়? তিনি কোথায়?

সবাই ওদের স্পোর্টস টীচারকে দেখতে চাইছে। দীপা রিনার কানে-কানে বলল, "বুড়ি কোথায় গেল রে? অনেক কথা শুনিয়েছিল বুড়ি, বুড়িকে মুখের মতো জবাব দেওয়া গেছে!"

রিনা বলল, "বুড়িকে ডেকে আনি। ওকে নিয়ে একট ফোটো না তুললে আবার মনে লাগবে ওর।"

রিনা আর দীপা ফোটোগ্রাফারকে একটু অপেক্ষা করতে বলে ছুটল বুড়ির খোঁজে। স্টেডিয়ামের নীচে ওদের ড্রেসিংরুমে গিয়ে দেখে টেবিলের ওপর মাথা রেখে বুড়ি উপুড় হয়ে আছে। আর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে উঠছে।

দীপা আর রিনা মুখ চাওয়াচায়ি করে চাপা গলায় ডাকল, "মিস্ রায়, মিস্ রায়।"

বুড়ি মুখ তুলে তাকাল। হাতে চশমা। চোখদুটি জলে ভরা। জবাফুলের মতো লাল।

"আয় দীপা, আয় রিনা।"

কী নরম গলা বুড়ির।

ওরা দুজনেই একটু অবাক হল।

"মিস্ রায়, মাঠে চলুন, আপনার সঙ্গে আমরা একটা ফোটো তুলতে চাই।"

মিস্ রায় ওদের দুজনকে জড়িয়ে ধরে আবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

"ওরে আজ আমার কী আনন্দ হচ্ছে জানিস! আমাদের স্কুল কোনোবার এত প্রাইজ একসঙ্গে পায়নি। আজ তিরিশ বছর ধরে এই স্কুলে স্পোর্টস টীচারের কাজ করছি—এত ভাল দল আর কখনো পাইনি আমি—কাঁদছি—তাই আনন্দে কাঁদছি—চোখে জল এসে যাচ্ছে—"

রিনা আর দীপাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিস্ রায় বললেন, "আমি যখন এই স্কুলে আসি, হেডমিসট্রেস ছিলেন মিস্ আলেকজাণ্ডার। আমায় বললেন, যে কাজ করবে তাই যেন তোমার ধ্যান-জ্ঞান হয়—সেই থেকেই এই আজ পর্যন্ত ঐ এক কাজই করে চলেছি—আর জানিস তো, এ-বছরই আমার শেষ বছর—"

চমকে উঠল রিনা আর দীপা। হঠাৎ রিনা বুঝতে পারল কান্না আর কষ্ট জমে উঠে তার গলার কাছটায় ঠেলে উঠছে— সে বুঝতে পারল মিস্ রায় কেন এত স্ট্রিক্ট, এত বকতেন, এত লেগে থাকতেন তাদের সঙ্গে? পুরনো চামড়ার ব্যাগ খুলে ম্লান-হয়ে-যাওয়া একটা গাটাপারচার-ঢাকা ফ্লাপের তলাকার ফোটো দেখালেন তিনি। "এই দ্যাখ সেই তিরিশ বছর আগের প্রথম স্পোর্টসের দলের সঙ্গে আমার ফোটো।" রিনা আর দীপা ঝুঁকে পড়ে দেখল একদল হাসিখুশি মেয়ের মাঝখানে ছিপছিপে সুন্দর একজন তরুণীর উজ্জ্বল মুখ। মিস্ রায়?

চেনাই যায় না। বুলবুলিদির চেয়ে অনেক সুন্দর, অনেক স্মার্ট! বয়স মানুষকে এত এতখানি পালটে দেয়!

ফোটোগ্রাফার যখন ছবি তুলবার আগে সবাইকে দাঁড়াতে বলল ঠিক হয়ে, রিনা বুঝতে পারল, মিস্ রায় একটি হাত দিয়ে তাকে কাছে টেনে নিয়েছেন। সেই উষ্ণ আলিঙ্গনের মধ্যে দাঁড়িয়ে রিনা কোনোরকমে বলতে পারল, "মিস্ রায়, আমি তো ছোট। বুঝতে পারিনি—বুঝতে পারিনি—আমায় ক্ষমা করুন!"

ছবি মাখন দত্তগুপ্ত



পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

[আগে যা ঘটেছে : কাকাবাবু আর সন্তু এবার অভিযানে এসেছে হিমালয়ে, এভারেস্ট চূড়ার দিকে। কিছুদূর এগোবার পর ইয়েতির মতন একটা বিশাল কিছু দেখে শেরপা এবং মালবাহকরা পালিয়ে যায়। মিংমা নামে একজন শেরপা অবশ্য একা পরে ফিরে আসে। এক সময় কাকাবাবু হঠাৎ দলটির পেছন থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। জ্ঞান ফেরার পর কাকাবাবু দেখলেন, তিনি মাটির তলায় একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে রয়েছেন। একজন মুখোশপরা লোক এবং একটা কুকুর রয়েছে সেখানে। মুখোশপরা লোকটি একটা রিভলভার হাতে নিয়ে নানারকম ভয় দেখাতে থাকে। এক সময় অতর্কিতে কাকাবাবু ল্যাং মেরে লোকটিকে মাটিতে ফেলে দিয়েই তার রিভলভারটা কুড়িয়ে নেন। তারপর—]

॥ ১৮ ॥

কাকাবাবু রিভলভারটা তুলেই দেয়ালের দিকে সরে গেলেন। তারপর রিভলভারটা টিপ করে রাখলেন লোকটির মাথার দিকে।

পড়ে যাবার পর লোকটি কোনো শব্দও করল না, একটু নড়লও না। একই জায়গায় পড়ে রইল উপুড় হয়ে। কাকাবাবু ভাবলেন, পাথরে মাথা ঠুকে কি অজ্ঞান হয়ে গেল লোকটি? কিন্তু অত জোরে তো পড়েনি! ও অন্য কোনো কায়দা করার চেষ্টায় আছে?

কাকাবাবু কঠোর ভাবে বললেন, "আপনি উঠে বসুন, তারপর আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিন। কোনোরকম ছেলেমানুষি করতে যাবেন না, আমার টিপ খুব ভাল, এক গুলিতে আপনার মাথাটা ছাতু করে দিতে পারি।"

লোকটি তবু নড়ল না।

কাকাবাবু বুঝতে পারলেন, তিনি এগিয়ে গিয়ে লোকটিকে টেনে তোলার চেষ্টা করলেই সে তখন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কাকাবাবু কুকুরটাকে ছুঁড়ে দেবার পরই সেটা ভয় পেয়ে পালিয়েছে। খানিকটা দূরে গিয়ে কুঁই-কুঁই করে ডাকছে। কাকাবাবু সেদিকে মনোযোগ দিলেন না। লোকটির উদ্দেশে আবার বললেন, "আমি এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুনব। তার মধ্যে উঠে না বসলে আমি আপনার গায়ে গুলি করব! এক,... দুই..."

সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ জোরালো সার্চ লাইটের আলোয় ভরে গেল সুড়ঙ্গটা। এতই জোর আলো যে, চোখ ধাঁধিয়ে গেল কাকাবাবুর। তিনি এক হাত দিয়ে চোখ আড়াল করলেন।

লোকটি এবার উঠে বসল আস্তে-আস্তে।

কাকাবাবু তাকে হুকুম দিলেন, "আলোর দিকে পেছন ফিরে বসুন। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করবেন না।"

এবার গম-গম করে উঠল মাইক্রোফোনের আওয়াজ। কে যেন একজন বলল, "অ্যাটেনশান, প্লীজ! মিঃ রায়চৌধুরী, ক্যান ইউ হীয়ার মি? মিঃ রায়চৌধুরী, আপনার হাতের পিস্তলটা ফেলে দিন। প্লীজ।"

কাকাবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন, সুড়ঙ্গের মধ্যে কোথায় লাউড স্পীকার ফিট করা আছে। কিছু দেখতে পেলেন না। ভাল করে তাকাতেই পারছেন না তো!

মাইক্রোফোনের আওয়াজে আবার সেই কথাটা ভেসে এল।

কাকাবাবু এবার উত্তর দিলেন, "হু এভার ইউ আর...সামনে এসে কথা বলুন, আমি এখন পিস্তল ফেলব না।"

মাইক্রোফোনের আওয়াজটা থেমে গেল। হঠাৎ দারুণ স্তব্ধ মনে হল জায়গাটা। মুখোশপরা লোকটি কাকাবাবুর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কোন দেশের লোক?"

লোকটি কোনো উত্তর না দিয়ে হাসল।

কাকাবাবু বললেন, "উত্তর না দিলে আমি গুলি করব।"

লোকটি তবু অবাধ্য ভঙ্গিতে ঝাঁকাল তার কাঁধদুটো।

এইসময় গটগট শব্দ হতেই কাকাবাবু চমকে তাকালেন। ঠিক একই রকম হলদে মুখোশপরা তিনজন লোক অনেকটা মার্চ করার মতন একসঙ্গে হেঁটে আসছে এদিকে।

তাদের হাতে বেশ লম্বা রিভলভারের মতন কোনো অস্ত্র।

তারা কাছাকাছি আসতেই কাকাবাবু বললেন, "সাবধান, আর এগোবেন না! তাহলে আমি এই লোকটিকে মেরে ফেলব।"

লোকগুলো তবু থামল না, তাদের মধ্যে একজন ইংরেজিতে বললেন, "মারুন! ওকে মারুন!"

চোখ-ধাঁধানো আলোর মধ্যে মুখটা এক-পাশে ফিরিয়ে কাকাবাবু রিভলভারের নলটা উঁচু করে ট্রিগারে হাত দিলেন।

লোক তিনটি কাকাবাবুর একেবারে পাশে এসে দাঁড়াল। একজন বলল, "কই, ওকে মারলেন না? ট্রিগার টানলেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "মানুষ মারা আমার পেশা নয়। বিশেষত কোনো নিরস্ত্র লোককে অস্ত্র দিয়ে আমি আক্রমণ করি না কখনো!"

সেই লোকটি বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, দয়া করে এখানে গোলমালের সৃষ্টি করবেন না। আপনার ওপর আমরা কোনো অত্যাচার করতে চাই না—"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কে?"

"আপনার কোনো প্রশ্ন করাও চলবে না এখানে। আমরাই প্রশ্ন করব। আপাতত আমরা আপনার চোখ বেঁধে দিতে চাই।"

"না!"

"আমাদের জোর করতে বাধ্য করবেন না।"

"আপনারা দেখছি ভদ্রতার প্রতিমূর্তি? শুনুন, আমি মানুষ মারার জন্য গুলি চালাই না ঠিকই, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য কারুর পা খোঁড়া করে দিতে পারি। আপনারা আমার গায়ে হাত দিলেই আমি এই লোকটির পায়ে গুলি করব।"

"ঠিক আছে, ওকে গুলি করুন না? খোঁড়া করে দিন! ওর একটু শাস্তি পাওয়া দরকার!"

আগের লোকটি এবার ভয় পাবার ভঙ্গিতে বলে উঠল, "ওরে বাপ রে, না না! আমার মাথায় খুব জোর লেগেছে, উনি এত জোর ল্যাং মেরেছেন!"

দু'জন লোক কাকাবাবুর কাঁধে হাত রাখতেই তিনি ওদের ভয় দেখাবার জন্য গুলি চালালেন। অমনি তাঁর রিভলভারের মধ্যে

(পরের পৃষ্ঠাটি পড়ুন)

ঘর-র ঘর-র শব্দ হল আর মুখটায় এক ঝলক আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু গুলি বেরুল না।

লোকগুলি হেসে উঠল হা-হা শব্দে। মাটিতে বসা লোকটিও যোগ দিল সেই হাসিতে।

কাকাবাবু একই সঙ্গে অবাক ও বিরক্ত হয়ে রিভলভারটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

একজন মুখোশধারী বলল, "এবার বুঝেছেন নিশ্চয়ই যে, ওটা একটা খেলনা পিস্তল!"

কাকাবাবু সেটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "একটা খেলনা পিস্তল দিয়ে আর ইয়েতির পোশাক পরিয়ে এই ক্লাউন-টিকে আপনারা আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন কেন? আপনারা কি ভেবেছিলেন, আমার মতন মানুষ এতে ভয় পাবে?"

তিনজন মুখোশধারীর মধ্যে একজনই সব কথা বলছিল। সে বলল, "আমাদের এখানকার জীবনে কোনো বৈচিত্র্য নেই, তাই আপনার সঙ্গে একটু মজা করা হল। আমাদের হাতের এগুলো কিন্তু খেলনা নয়! দেখবেন?"

লোকটি সেই রিভলভারের মতন অস্ত্রটা কাঁধের ওপর রেখে পেছন দিকে গুলি চালাল। সাধারণ রিভলভারের থেকে শব্দ হল অনেক বেশি, দেয়ালে গুলি লেগে পাথরের চলটা ছিটকে পড়ল নানান দিকে তার একটা কাকাবাবুর গায়েও লাগল।

লোকটি এরপর বলল, "নাম্বার সেভেন. উঠে দাঁড়াও, মিঃ রায়চৌধুরীর চোখ দুটো ভাল করে বেঁধে দাও!"

কাকাবাবু বললেন, "কেন, আপনারা আমার চোখ বাঁধতে চাইছেন কেন?"

"ছিঃ, মিঃ রায়চৌধুরী, ভুলে গেলেন এরই মধ্যে? বললুম না যে আপনার কোনো প্রশ্ন করা চলবে না।"

দু'জন লোক কাকাবাবুকে দু'পাশ থেকে ধরে দাঁড় করাল। কাকাবাবু শক্তভাবে বললেন, "আপনারা চারজন মিলে জোর করে যা খুশি করতে পারেন। কিন্তু আমি চোখ খোলা রাখতে চাই। আর আমার ক্রাচ দুটো ফেরত পেলে খুশি হব।"

"আপনি চোখ খোলা রাখতে চান? আচ্ছা, দেখা যাক, আপনি চোখ খোলা রাখতে পারেন কি না, আমরা জোর করব না!"

লোকগুলি তাদের প্যান্টের পকেট থেকে ঠুলির মতন বিশেষ ধরনের চশমা বার করে পরে নিল। তারপর একজন চেঁচিয়ে বলল, "লাইট!"

তখন আলোটা আরও জোর হয়ে গেল। কাকাবাবু চোখ বুজে ফেললেন। লোকগুলি হেসে উঠল। তাদের দলপতি বলল, "দেখলেন তো, চোখ খোলা রাখতে পারলেন না।"

কাকাবাবু উলটো দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "এবার চোখ চাইতে পারছি।"

"কিন্তু আমরা যদি সব সময় এতটা আলো জেবলে রাখি, তা হলে আপনি কি শুধু একদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে থাকবেন? তা কি হয়?"

"আপনারা আমার চোখ বেঁধে কোথায় নিয়ে যেতে চান?"

"উঁহু, প্রশ্ন নয়, কোনো প্রশ্ন নয়!"

একজন একটা কালো রঙের বালিশের ওয়াড়ের মতন জিনিস গলিয়ে দিল কাকা-বাবুর মাথায়। তারপর পেছন দিকটা টেনে ফাঁস বেঁধে দিল।

কাকাবাবু ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করলেন, "এবার আমার হাত দুটো বাঁধবেন না?"

"না। তার দরকার নেই।"

"তা হলে এটা তো আমি যে-কোনো সময় গিঁট খুলে দিতে পারি।"

"চেষ্টা করে একবার দেখুন তো। পার-শিয়ান নটের কথা শুনেছেন? স্বয়ং আলেক-জান্দার পর্যন্ত যে গিঁট খুলতে পারেননি, এ হচ্ছে সেই ধরনের গিঁট।"

"হুঁ, কিছু লেখাপড়া জানা আছে দেখছি। আপনারা শিক্ষিত লোক, অথচ মুখোশ পরে রিভলভার হাতে নিয়ে থাকেন, অর্থাৎ গুণ্ডা, বদমাইসদের মতন কোনো বে-আইনি কাজ করছেন!"

"আপনি অরণ্যদেবের কমিকস পড়েন? অরণ্যদেবও তো মুখোশ পরে থাকেন, তাঁর কাছে রিভলভারও থাকে, কিন্তু তিনি কি গুণ্ডা?"

"ডোনট বি রিডিকুলাস! কোথায় যেতে হয় চলুন! আপনারা আমার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছেন, কিন্তু আজ থেকে তিন-

দিনের মধ্যে আপনারা সবাই ধরা পড়বেন এবং জেলে যাবেন।''

"সত্যি, মিঃ রায়চৌধুরী? আপনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন?"

"আমি কারুকে মিথ্যে ভয় দেখাই না! ভাল্লুকের ছাল দিয়ে তৈরি ইয়েতির মতন একটা পোশাক পরে লোকদের ভয় দেখান আর খড়মের মতন কোনো জিনিস দিয়ে বরফের ওপর পায়ের ছাপ এঁকে আসেন। এসব ভেল্কি বেশিদিন চলে না!"

"তিনদিন পরেই তাহলে আমরা ধরা পড়ে যাব বলছেন? কে ধরতে আসবে?"

"মিলিটারি পুলিস। আপনাদের এখানে যত বড় দলবলই থাক, তবু কোনো সরকারের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই আপনাদের নেই!"

"কিন্তু মিলিটারি পুলিস কী করে আমাদের সন্ধান পাবে?"

''ইয়েতি যখন-তখন অদৃশ্য হয়ে যায়, এক পলক দেখা দেবার পরই মিলিয়ে যায়— এসব শুনে আমি বুঝেছিলুম যে, এখানে মাটির নীচে কোনো কাণ্ডকারখানা আছে।"

"সেকথা বোঝা স্বাভাবিক! বিশেষ করে আপনার মতন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তো বুঝবেনই। কিন্তু মিলিটারি পুলিস বুঝবে কী করে যে মাটির নীচে ঠিক কোন জায়গায় আমরা আছি? তারা তো সারা হিমালয়টা খুঁড়ে ফেলতে পারে না!"

কাকাবাবু চুপ করে গেলেন।

দলপতি বললেন, "অর্থাৎ সেকথা আপনি আমাদের বলে দিতে চান না। তাই না? আমি যদি বলি, আপনি আমাদের মিথ্যেই ভয় দেখাচ্ছেন! আমাদের সন্ধান বাইরের লোকের পাওয়ার কোনো উপায়ই নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "উপায় নিশ্চয়ই আছে। ধরে নিন যে, আমার একটা অলৌকিক ক্ষমতা আছে। আমি মনে-মনে খবর পাঠাতে পারি। আমি যেখানেই থাকি, আমার বন্ধুরা তা ঠিক টের পেয়ে যায়। আমাকে উদ্ধার করার জন্যই তারা এখানে এসে পড়বে!"

মুখোশধারীরা একসঙ্গে অট্টহাসি করে উঠল।

দলপতি আবার বলল, "আপনার যে অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তাও আমি জানি। সে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে! এবার চলুন,

অন্য জায়গায় গিয়ে কথাবার্তা হবে।"

দু'জন দু'পাশ থেকে ধরে ধরে কাকাবাবুকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। কাকাবাবুর একবার মনে হল, ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাবার সময় আসামীদের এইভাবে চোখ-মুখ ঢেকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এরা তাঁকে মেরে ফেলতে পারে একথা তাঁর বিশ্বাস হল না।

একজন মুখোশধারী বলল, "ইস, সত্যিই মিঃ রায়চৌধুরীর ক্রাচ দুটোর কথা খেয়াল করা উচিত ছিল। ও'র হাঁটতে খুব অসুবিধে হচ্ছে!"

অন্য একজন বলল, "ও'কে উঁচু করে তুলে নিয়ে যাওয়া যাক!"

কাকাবাবু আপত্তি করার আগেই ওরা সবাই মিলে কাকাবাবুকে শূন্যে তুলে নিয়ে দৌড়তে লাগল। বাধা দেওয়া নিষ্ফল বলে কাকাবাবু চুপ করে রইলেন।

বেশ খানিকটা যাবার পর ওরা এক জায়গায় এসে থামল, কাকাবাবুকে নামিয়ে দিল মাটিতে। অন্য একজন কেউ বেশ গম্ভীর গলায় বলল, "মিঃ রায়চৌধুরীকে ঐ চেয়ারটায় বসিয়ে দাও। তারপর খুলে দাও মুখের ঢাকনাটা।"

কাকাবাবু অনুভব করলেন, ওরা পেছনের দিকে ফাঁসটা খোলার চেষ্টাই করল না, একটা ছুরি দিয়ে চচ্চড় করে চিরে দিল কাপড়টা। পারশিয়ান নটই বটে!

সামনে তাকিয়েই কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "এ কী?"

(ক্রমশ)



সদুপায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র



আরে আরে কাঁপছ যে!
ওটা দেখে এত ভয়?
ওটা শুধু খ্যাপা এক
ষাঁড় বই কিছু নয়।
দুটো শিঙ আছে বটে
ডগাগুলো ছুঁচলো
চোখ আগুনের ভাঁটা
তাতেই বা কী হল!

খুর দিয়ে মাটি খোঁড়ে
শ্বাস ছাড়ে ফোঁস ফোঁস
মনে হয় সাক্ষাৎ
শমনের আক্রোশ।
তাতেই বা ভয়টা কী?
বলে দিই প্রতিকার।
মন্তর জানা আছে
সব ফাঁড়া কাটাবার।
খ্যাপা ষাঁড় কোনোখানে
যদি মারমুখো হয়
মধুর হাসিটি যেন
মাখা থাকে মুখময়।
তখন আদর করে
বলো যদি ধিক, ধিক
লজ্জায় খ্যাপা ষাঁড়
হবে ঠিক সাত্ত্বিক।
তা না হলে আছেই তো
মোক্ষম সদুপায়,
কষে দেবে চোঁ-চা ছুট
যে দিকে দু'চোখ যায়!

ছবি দেবাশিস দেব

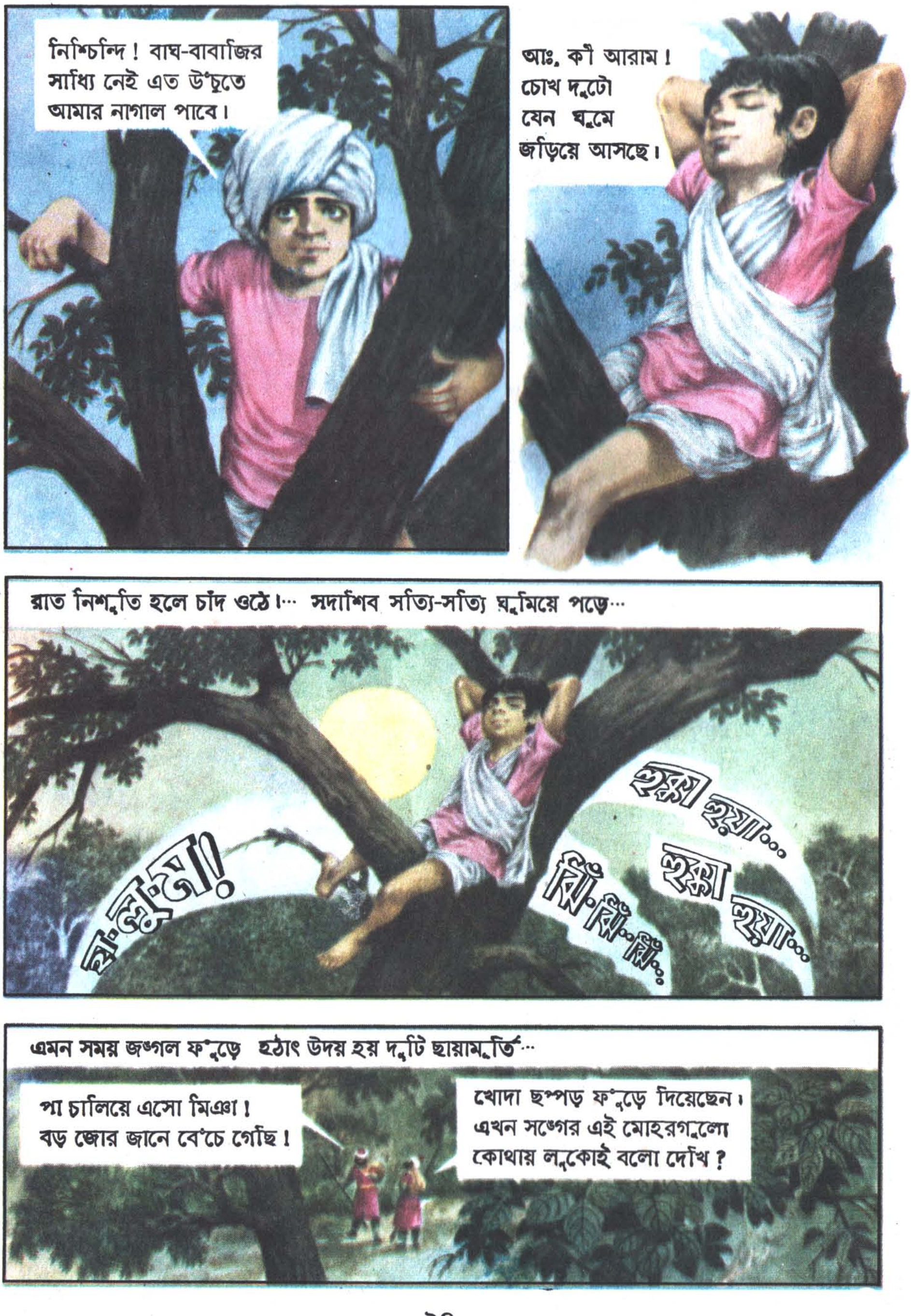
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদাশিব

আদিকাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার

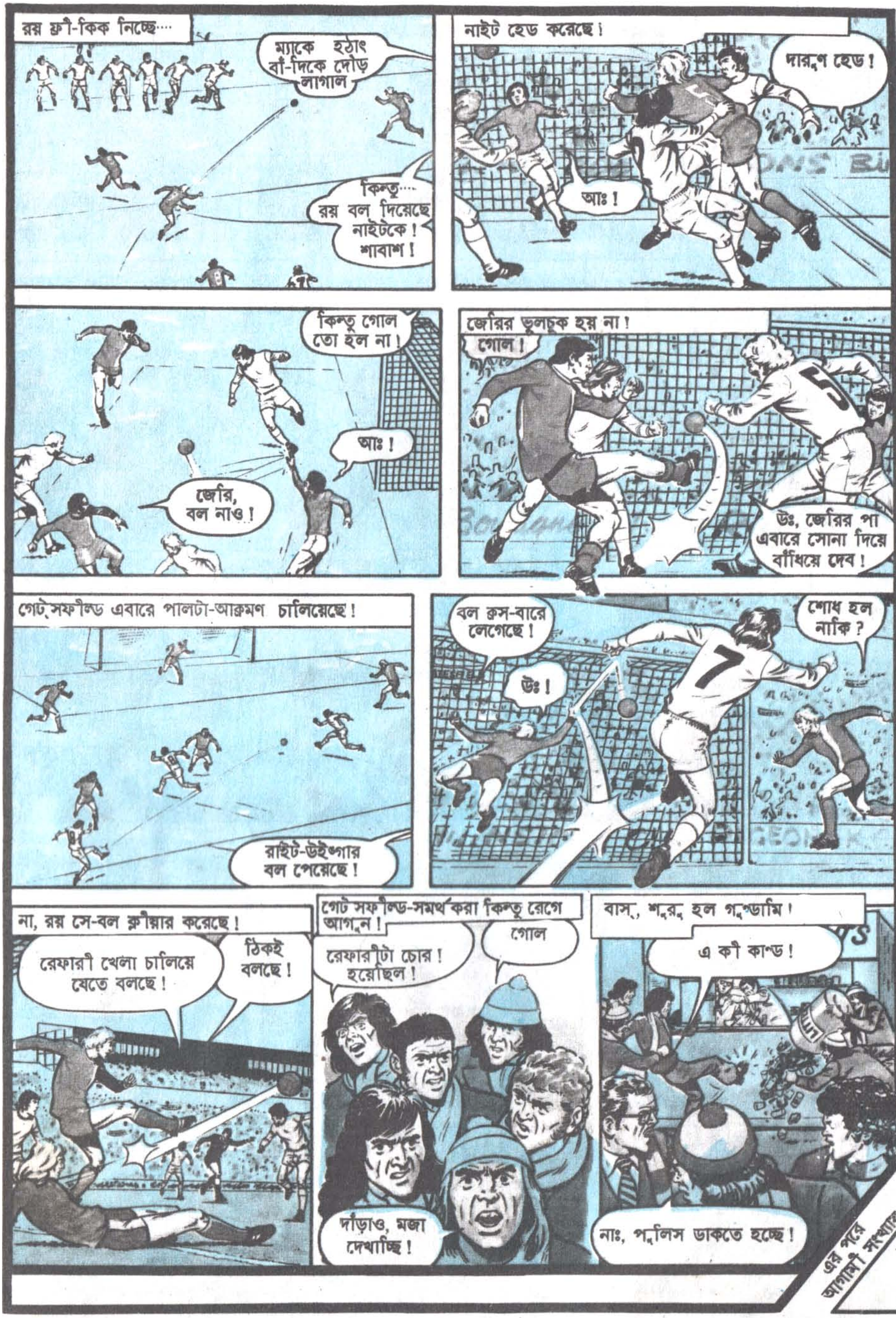
ছবি : বিমল দাশ

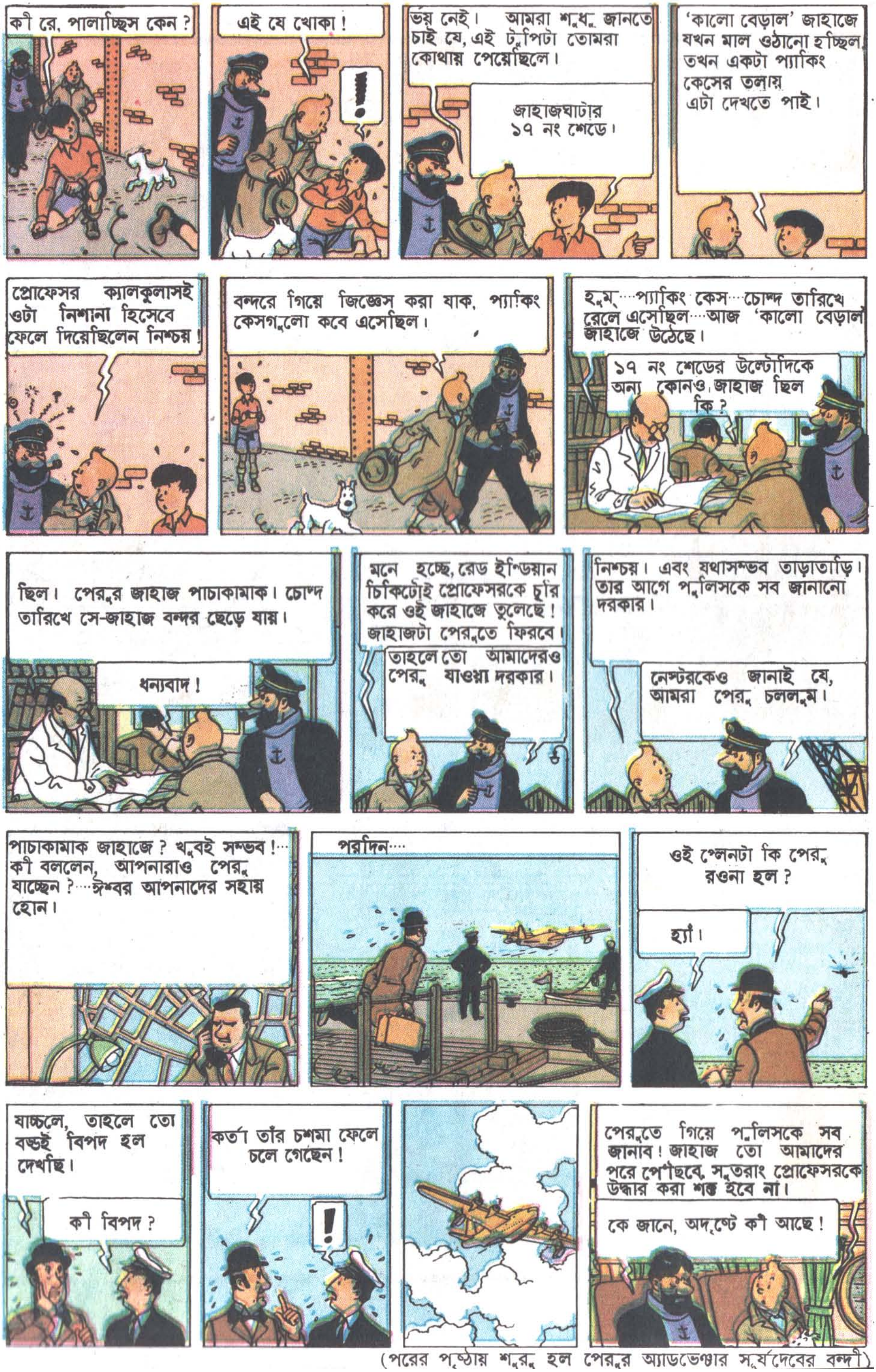




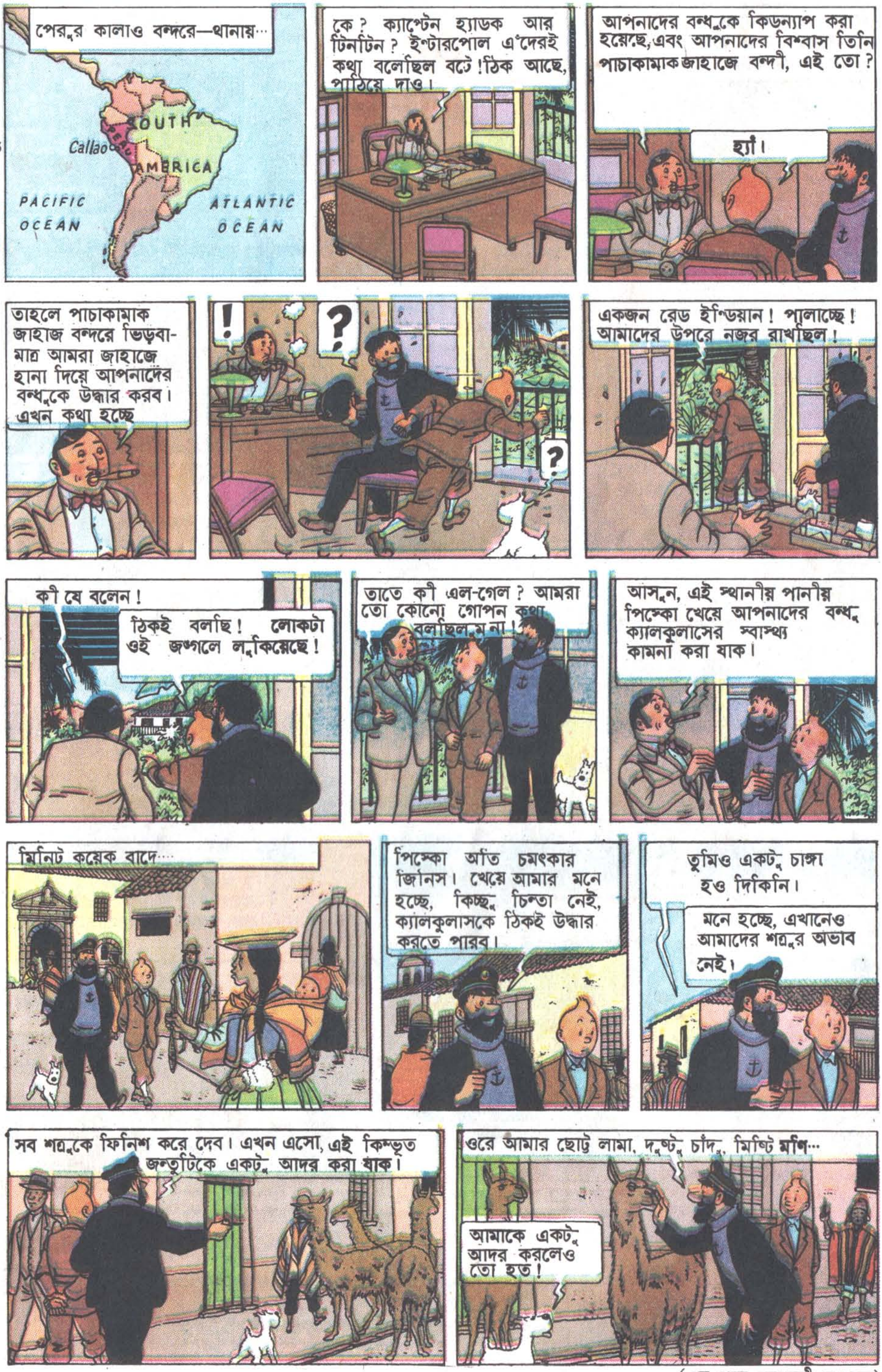
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


রোভার্সের রয়
মেলচেস্টার-রোভার্সের খেলোয়াড়-ম্যানেজার রয় রেস তার নিজের ক্লাবের সমর্থকদের শান্ত রাখতে পেরেছে। কিন্তু 'গেট্‌সফীল্ড গান্‌স' দলের সমর্থকদেরও সে শান্ত রাখতে পারবে তো?
আমরা এসে গেছি!
গেট্‌সফীল্ড
রোভার্সের সমর্থকরা হাঙ্গামা বাধাতে পারে! তৈরি থাকো!
মেলচেস্টারকে হারাব!
রোভার্সের সমর্থকরা সত্যি অপেক্ষা করছে। তবে···
স্বাগত গেট্‌সফীল্ডের বন্ধুরা। আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে তোমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।
WELCOME TO GATESFIELD SUPPORTERS
GATESF
টেলিভিশনের লোকেরা ছবি তুলছে এই আশ্চর্য দৃশ্যের···
আমরা ভেবেছিলুম, রয় পাগল। কিন্তু তার প্রস্তাবমতো কাজ করায় সত্যি সুফল পাওয়া গিয়েছে।
TV
WELCOME TO GATESFIELD SUPPORTERS
তারপর···রোভার্স যখন মাঠে নামল···
ছোটখাটো দুটো-একটা গণ্ডগোল হয়েছে। মোটামুটি সব শান্ত।
তাহলে চলো, গোটাকয় দেওয়া যাক।
কিন্তু রয় যখন বল নিয়ে এগোচ্ছে···
উঃ!
এ কী ব্যাপার?
এইয়ো!
বল নিয়ে এগোলেই এইভাবে আটকাব!
এ-লোকটা তো দেখছি পাকা গুণ্ডা!
দেব নাকি এক ঘা লাগিয়ে?
না, রেফারীই সব দেখছেন!
ফ্রী-কিকটা তো নেওয়া যাক!

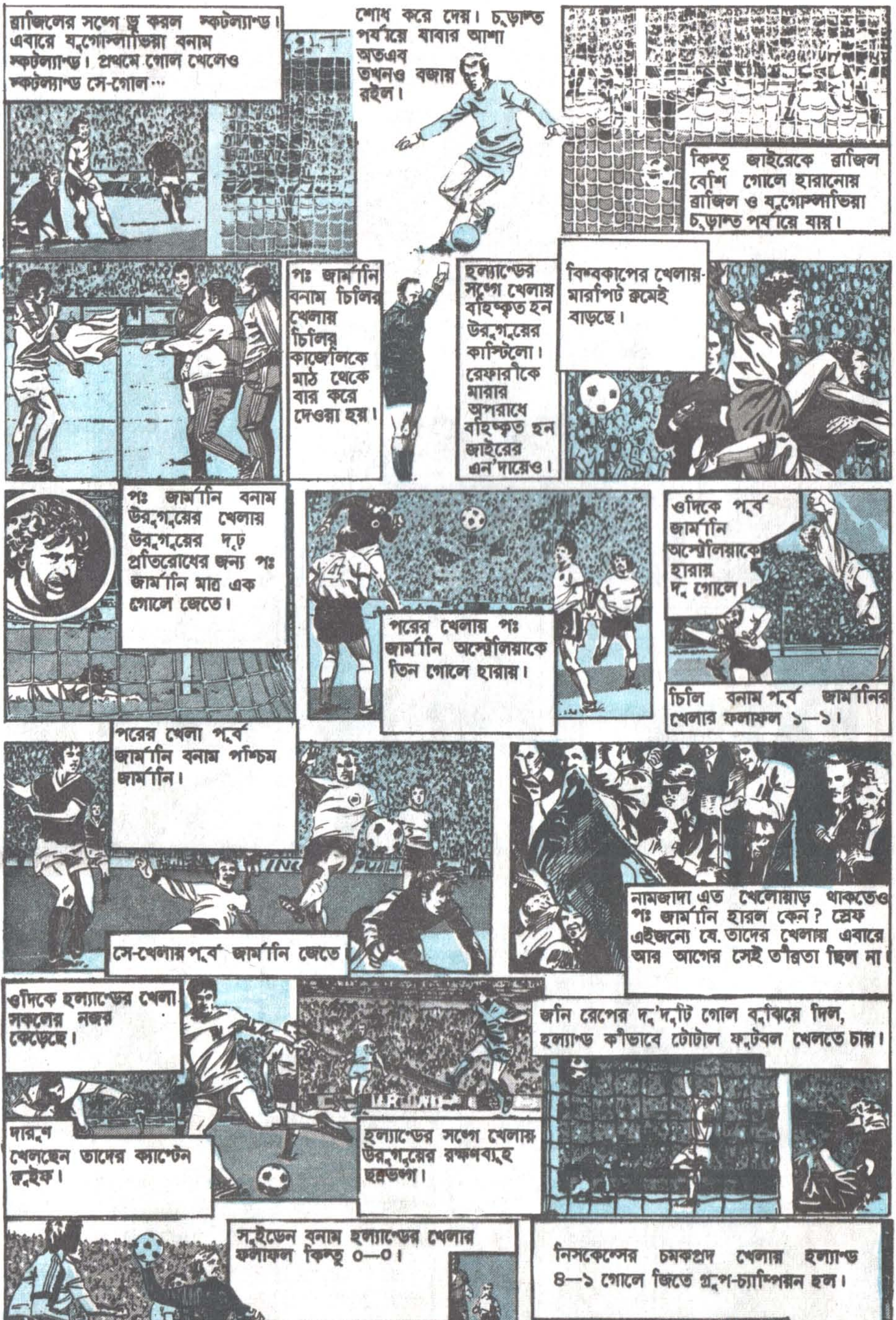

রয় ফ্রী-কিক নিচ্ছে…
ম্যাকে হঠাৎ বাঁ-দিকে দৌড় লাগাল
কিন্তু… রয় বল দিয়েছে নাইটকে! শাবাশ!
নাইট হেড করেছে!
দারুণ হেড!
আঃ!
কিন্তু গোল তো হল না!
আঃ!
জেরি, বল নাও!
জেরির ভুলচুক হয় না!
গোল!
উঃ, জেরির পা এবারে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব!
গেট্‌সফীল্ড এবারে পালটা-আক্রমণ চালিয়েছে!
রাইট-উইঙ্গার বল পেয়েছে!
বল ক্রস-বারে লেগেছে!
উঃ!
শোধ হল নাকি?
না, রয় সে-বল ক্লীয়ার করেছে!
রেফারী খেলা চালিয়ে যেতে বলছে!
ঠিকই বলছে!
গেট্‌সফীল্ড-সমর্থকরা কিন্তু রেগে আগুন!
রেফারীটা চোর! গোল হয়েছিল!
দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি!
বাস্‌, শুরু হল গুণ্ডামি!
এ কী কাণ্ড!
নাঃ, পুলিস ডাকতে হচ্ছে!
এর পরে আগামী সংখ্যায়



(পরের পৃষ্ঠায় শুরু হল পেরুর অ্যাডভেঞ্চার সূর্যদেবের বন্দী)



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



কে?

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে : জয়রামবাবুর ছেলে জ্যোতি নিরুদ্দেশ। চন্দ্রভানু চুরি করেছেন তাকে। জ্যোতিকে নিয়ে ট্রেনযাত্রায় মধ্যরাতে দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে পুলিসের-হাতে-আটক বেহুঁশ একটি ছেলেকে জ্যোতি ভেবে গ্রহণ করেছেন জয়রামবাবু, ওদিকে স্মৃতিভ্রষ্ট আসল-জ্যোতি চান্দোলির দোকানি চৌবেজির ঘরে ঠাঁই পেয়েছে। চান্দোলির সূর্য-নারায়ণ জয়রামের পুরনো বন্ধু; ইতিমধ্যে কলকাতায় এসেছিলেন তিনি। নকল-জ্যোতি তার দিনকয়েক বাদে উধাও হয়ে যায়। আসল-জ্যোতি ভেবে, লোক লাগিয়ে, তাকেও চন্দ্রভানু চুরি করেছেন। তারপর....

॥ ১৫ ॥

বড়ে মিয়া বললে, "গাড়ির মধ্যেই রয়েছে। ওকে কি তুলে আনব?"

চন্দ্রভানুবাবু আর থাকতে পারলেন না। আর তা ছাড়া গুণ্ডা-জাতদের ওপর তাঁর বিশ্বাস নেই। কার ছেলে আনতে কার ছেলেকে চুরি করে আনবে, কে জানে! জীবনে তিনি অনেকবার ঠকেছেন। তিনি সেই ঝাপ্‌সা অন্ধকারের মধ্যেই গাড়ির ভেতরে পেছনের সীটের দিকে চেয়ে দেখলেন। ছেলেটা তখনও অচৈতন্য হয়ে সেখানে শুয়ে আছে। হ্যাঁ, ঠিক সেই জ্যোতিই বটে। যেমনটি তিনি তাকে দেখেছিলেন জয়রামবাবুর বাড়িতে।

চন্দ্রভানুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ও কি অজ্ঞান হয়ে আছে?"

বটা বললে, "এখন অজ্ঞান হয়ে আছে, কিন্তু বেশিক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকবে না, একটু পরেই আবার ওর জ্ঞান ফিরে আসবে!"

"কেউ জানতে পারেনি তো?"

বটা বললে, "ওর নাকে তো ওষুধ শুঁকিয়ে দিয়েছিলাম, কেউ জানতে পারবে কী করে?"

"আর ওর বাপ? বাপের ঘরেই তো ও শুয়ে থাকত নিশ্চয়!"

"হ্যাঁ, ওর বাপ যে ঘরে শোয়, এও সেই একই ঘরে অন্য খাটে শুয়ে ছিল। আমি দেয়াল বেয়ে দোতলায় উঠে ওর ঘরে ঢুকে ওর নাকে ওষুধ মাখানো রুমাল চাপা দিয়ে ওকে অজ্ঞান করে দিলুম। তারপর ওকে চ্যাংদোলা করে নীচে নিয়ে এসে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে আসছি—"

"আর এই ট্যাক্সি-ড্রাইভার? এ পুলিসকে বলে-টলে দেবে না তো?"

বড়ে মিয়া হেসে উঠল। বললে, "আরে স্যার, এর কথা আপনাকে ভাবতে হবে না, এ আমাদের দলের ট্যাক্সি-ড্রাইভার। একে আপনার কোনও ভয় করবার দরকার নেই।"

"এ আমাকে দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে পারবে?"

"নিশ্চয়ই পারবে স্যার, আপনি যেখানে যেতে চাইবেন, এ সেখানেই আপনাকে নিয়ে যাবে। আপনি এর ভাড়াটা দিয়ে দিলেই হল।"

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, "তাহলে ঠিক আছে, আমি এই ট্যাক্সিতেই যাচ্ছি। আর তোমরা তোমাদের বাকি টাকাটা নাও—"

বলে পকেট থেকে বাকি টাকাটা বার করে বড়ে মিয়ার হাতে দিয়ে দিলেন। বললেন, "টাকাগুলো গুনে নাও।"

বড়ে মিয়া টাকাগুলো গুনে ট্যাঁকে গুঁজল। বললে, "ঠিক আছে স্যার।"

চন্দ্রভাবুবাবু ট্যাক্সিতে উঠে বসতেই ড্রাইভার ট্যাক্সি স্টার্ট দিলে। তারপর তিনি নিজের হোটেলের দিকে গেলেন। সেখানে নিজের কামরায় গিয়ে স্যুটকেসটা নিয়ে একতলায় নেমে এসে হোটেলের দাম মিটিয়ে দিলেন। তারপর আবার এসে বসলেন ট্যাক্সিতে। বললেন, "চলো, এবার দমদম এয়ারপোর্টে চলো।"

ট্যাক্সিটা চলতে লাগল। জ্যোতি তখনও শুয়ে আছে তার সীটের ওপর। সে জানতেও পারলে না কোথায় কত দূরে সে যাচ্ছে। সে অনেক দূরে যেতে চেয়েছিল একবার। এবার সে অনেক দূরে যাচ্ছে। কিন্তু এবার আর ট্রেনে নয়, প্লেনে। ট্রেনে যাওয়ার ফলে সেবার দুর্ঘটনা ঘটেছিল, এবার বোধহয় আর সে-ভয় নেই।

চলতে চলতে চন্দ্রভানুবাবু আর একবার পেছন ফিরে দেখলেন। দেখলেন জ্যোতি সেই একই রকম ভাবে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে শুয়ে পড়ে আছে—

যত সাধু-সন্ন্যাসীদের আড্ডা চান্দোলির গঙ্গার ঘাটে। কোনও-না-কোনও পুজো-পার্বণ হলেই কোথা থেকে সব সাধু-সন্ন্যাসী এসে সেখানে জোটে। লোকে যা দেয় তারা তাই-ই খায়। শীতের কনকনে ঠাণ্ডায় তারা শুয়ে থাকে। দেবদত্তর বড় ভাল লাগে সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলতে। তারা কোথা থেকে আসে, কোথায় তাদের ঘর-বাড়ি, তারা কেন ঘর-বাড়ি ছেড়ে সাধু হয়েছে, তা তার কেবল জানতে ইচ্ছে করে।

তারা কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে, "খোকা, তোমার বাড়ি কোথায় ?"

সে বলে, "ওই যে বড় গাছটা দেখছ, ওরই ওপাশে।"

তারা জিজ্ঞেস করে, "তোমার নাম কী ?"

সে বলে, "আগে আমার কী নাম ছিল তা জানি না, এখন বড়বাবু আমার নাম রেখেছে দেবদত্ত।"

"বড়বাবু ? বড়বাবু কে ?"

"আমি যাঁর বাড়িতে থাকি তাঁকে আমি বড়বাবু বলে ডাকি।"

"তোমার বাবা-মা কেউ নেই ?"

দেবদত্ত বলে, "তা জানি না। আগেকার কথা আমার কিছু মনে নেই।"

"তুমি এখানে কোথা থেকে এলে ?"

"হাসপাতাল থেকে। হাসপাতালে আমি একটা বিছানায় শুয়ে থাকতুম। সেখানে সবাই আমাকে বললে আমাকে তারা পুলিস দিয়ে ধরিয়ে দেবে। তাই আমি এখানে পালিয়ে এসেছি।"

যে-কেউ তার পরিচয় জিজ্ঞেস করে সে এই উত্তরই দেয়। কিন্তু ওরা নিজেদের কোনও পরিচয় দেয় না। তারা শুধু বলে, "আমরা শুধু সন্ন্যাসী, আর কিছু পরিচয় নেই।"

আর কত রকমের যে সাধু-সন্ন্যাসী তার হিসেব নেই। কেউ আবার কথা বলে না, মৌনী। শুধু সামনে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকে আর চুপ করে সকলের কথা শোনে। কিছু জবাব দেয় না কারও কোনও কথার। কিন্তু দেবদত্ত যে তাদের সঙ্গে ভাব জমাবে, তাদের কাছে মনের কথাগুলো বলবে তারও উপায় নেই। কারণ সব সময়েই তাদের কাছে মানুষের ভিড় লেগে আছে। মানুষের কত চাহিদা তাদের কাছে। কেউ জানতে চায় কবে তাদের চাকরি হবে, কবে তাদের অনেক টাকা হবে, কবে তাদের মেয়ের বিয়ে হবে, কিংবা কবে তাদের অসুখ সারবে।

দেবদত্ত হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

সূর্যনারায়ণবাবু জিজ্ঞেস করতেন, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?"

দেবদত্ত বলত, "গঙ্গার ঘাটে।"

"গঙ্গার ঘাটে এতক্ষণ ধরে কী করছিলি ?"

"এমনি বেড়াচ্ছিলুম।"

"তা এত জায়গা থাকতে গঙ্গার ঘাটে তোর কিসের কাজ থাকে ?"

"এমনি বেড়াই।"

"লেখা-পড়া না করে বেড়ালে চলবে ?"

দেবদত্ত বলত, "লেখা-পড়া শিখে কী লাভ হবে ?"

সূর্যনারায়ণবাবু বলতেন, "লেখা-পড়া শিখে কিছু হবে না, আর যত লাভ হবে ওই ভিখিরি গুণ্ডা আর সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশে ? ওদের তো কেবল টাকা কামাবার ফিকির।"

দেবদত্ত বলত, "না বড়বাবু, অনেক ভাল-ভাল লোকও আছে ওদের মধ্যে।"

"থাক, ভাল-ভাল লোক, ওদের সঙ্গে মিশে কোনও লাভ হবে না তোমার। তার চেয়ে যা করলে মানুষ হবে সেই কাজ করাই ভাল।"

"কী কাজ করলে মানুষ হব ?"

সূর্যনারায়ণবাবু বলতেন, "লেখা-পড়া করলে। নইলে আমি অত টাকা মাইনে দিয়ে তোমার জন্যে মাস্টার রেখেছি কেন ? তোমাকে লেখা-পড়া শেখাবার জন্যেই তো ! লেখা-পড়া শিখলেই তো তবে মানুষ হতে পারবে। তোমাকে ভাল-ভাল বই ছবির-বই কিনে দিয়েছি কী জন্যে ? তোমার যাতে জ্ঞান হয় সেই জন্যেই তো।"

দেবদত্ত বললে, "কিন্তু এই পৃথিবীও তো একটা বই। এই পৃথিবীটা দেখলেই তো বই পড়ার কাজ হয়ে যায়। ছাপানো বই পড়ার চেয়েও তো তাতে বেশি লাভ হয়।"

সূর্যনারায়ণবাবু দেবুর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, "এসব কথা তোমাকে কে শিখিয়েছে ?"

সূর্যনারায়ণবাবু রেগে গেলেন। বললেন, "ওই সাধু ব্যাটারাই তোমার মাথাটা খাবে। তোমাকে বার-বার বলেছি না যে ওদের



খপ্পরে পোড়ো না। তবু তুমি ওদের সঙ্গে মেলা-মেশা করবে? জানো না যে ওদের কেবল পয়সা নেবার ফিকির।”

দেবদত্ত কোনো উত্তর দিলে না।

সূর্যনারায়ণবাবু আবার বলতে লাগলেন, “আমরা কত কষ্ট করে টাকা-পয়সা উপায় করব আর ওরা কেবল বসে বসে সেই টাকা-পয়সায় পেট ভরাবে! ওদের কথায় তুমি বিশ্বাস করো? ওরা সব জোচ্চোর। সেই সেবার তুমি খুব করে জিদ করলে তাই এক ব্যাটা সাধুকে টাকা দিতে হল। টাকা কোত্থেকে আসে তা তো তুমি খোঁজ রাখ না। সে-খবর রাখবার তোমার দরকারও নেই। তুমি ছেলেমানুষ, তাই তোমাকে এত কথা বলতে হচ্ছে। আমি যখন মারা যাব তখন তো তুমিই এই সব টাকা-কড়ি-সম্পত্তির মালিক হবে, তখন? তখন যদি তুমি এই রকম করে টাকা ওড়াও তাহলে তো একদিন তোমাকে সবাই মিলে পথের ভিখিরি করে ছাড়বে! তখন তোমাকে পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে যে।”

দেবদত্ত এ-কথার কোনও জবাব দিলে না।

সেদিন হঠাৎ অনেক দিন পরে আবার সেই পুরনো সাধুটার সঙ্গে দেখা। কিন্তু সাধুটা কোনও কথা বললে না তার সঙ্গে।

দেবদত্ত বললে, "আমাকে চিনতে পারছ না সাধুবাবা?"

সাধুবাবা তাকে যেন দেখেও দেখলে না। মুখ ঘুরিয়ে রইল।

অনেকবার ডাকার পর সাধুবাবা একবার মুখ ফেরাল। জিজ্ঞেস করলে, "কে তুই?"

দেবদত্ত বললে, "সেই যে আমি তোমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলুম। বড়বাবুকে বলে তোমাকে পঞ্চাশটা টাকা পাইয়ে দিয়েছিলুম?"

সাধুবাবার চোখ দু'টো এমনিতেই লাল। দেবদত্তর কথা শুনে সে-দু'টো আরো লাল হয়ে উঠল।

বললে, "আমায় টাকা দিয়েছিল বড়বাবু?"

দেবদত্ত বললে, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। তোমার তো ঠিক মনে আছে দেখছি। আর টাকা চাই তোমার? তুমি যদি চাও তো আবার তোমায় কিছ টাকা পাইয়ে দিতে পারি।"

সাধুবাবা বললে, "না, আর টাকা চাই না। সেবারই আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে।"

দেবদত্ত অবাক হয়ে গেল। বললে, "তার মানে?"

"তার মানে সেবার তো তোর বড়বাবু দরোয়ান পাঠিয়ে আমার টাকা কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল!"

"সে কী? তুমি সে-টাকা পাওনি?"

"কী করে পাব? তোর সামনে তো বড়বাবু আমার হাতে টাকা দিলে। কিন্তু সেই টাকা নিয়ে যখন আমি অনেক দূরে চলে গিয়েছি তখন এক ব্যাটা দরোয়ান দৌড়তে-দৌড়তে আমার কাছে এসে আমার কাছ থেকে টাকাগুলো ফেরত চাইলে। চাইতেই আমি টাকা ফেরত দিয়ে দিলুম। আমি মনে মনে হাসলুম। টাকা ফেরত নিলে তাতে আমার কী-ই বা লোকসান হল। টাকা-রুপেয়া ফেরত নিয়ে নিলে কি আমি ফতুর হয়ে গেলুম? ও তো হাতের ময়লা রে! আমি কি টাকার পরোয়া করি? একদিন তো আমারও অনেক টাকা ছিল। আমারও বাবার তো অনেক টাকা ছিল, অনেক সম্পত্তি ছিল। তাহলে আমি সে-সব ছেড়ে পথে নেমেছি কেন? সেই টাকার জন্যে? আমার আসল জিনিস তো কেড়ে নিতে পারলে না!"

দেবদত্ত রাগে তখন গর্-গর্ করছে। তাহলে বড়বাবু তাকে ঠকিয়েছে! তাকে তো এর সম্বন্ধে কিছুই বলেনি বড়বাবু! তার সামনে সাধুবাবাকে টাকা দিয়ে আড়ালে কায়দা করে টাকা কেড়ে নেওয়া?

বললে, "সাধুবাবা, তুমি দাঁড়াও, কোথাও যেও না, আমি একবার বাড়ি গিয়ে বড়বাবুকে দেখে নিচ্ছি—"

বলে দৌড়ে বাড়ির দিকে গেল!

সেদিন সূর্যনারায়ণবাবু নিজের বৈঠকখানায় বসে ছিলেন। পোস্ট-অফিসের একজন পিওন এসে তাঁকে একটা চিঠি দিয়ে গেল। খামের ভেতরে চিঠি। খামটা ছিঁড়ে ফেলে চিঠিটা ভেতর থেকে বার করলেন।

চিঠিটা লিখেছেন কলকাতা থেকে জয়রাম চট্টোপাধ্যায় মশাই।

তিনি লিখেছেন— "ভাই সূর্যনারায়ণ, তুমি শুনে দুঃখ পাবে যে, যে-জ্যোতিকে আমি ভগবানের দয়ায় আবার ফিরে পেয়েছিলুম সে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। আমার এই হতভাগ্য জীবনে একমাত্র সান্ত্বনা ছিল পুত্র। সেই পুত্রই দু'বার হারিয়ে গেল। প্রথমবার তাকে পুলিসের সাহায্যে আমি ফিরে পেয়েছিলাম। কিন্তু সেই পুত্রকে আবার কেন হারালাম তা জানি না। সেদিন যথারীতি তার সঙ্গে আমি একই ঘরে শুয়েছিলাম, কিন্তু ভোর বেলা ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি সে বিছানায় নেই। অনেক খোঁজ নিয়েছিলুম, পুলিসেও খবর দিয়েছিলাম, কিন্তু কেউই তার সন্ধান দিতে পারেনি। আমার শরীর ও মন সবই খারাপ। সেই জন্য আমি তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়েছি। কাশী, গয়া, পুরী ও নবদ্বীপ ঘুরে এবার তোমার কাছে যাচ্ছি। ইচ্ছে আছে তোমার কাছে কিছুদিন কাটাব। তুমি অনেকবার আমাকে তোমার বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ করেছিলে। কিন্তু তখন যেতে পারিনি। এবার মায়ার বন্ধন কেটেছে। আমি আগামী ১৪ই অগ্রহায়ণ সকালের ট্রেনে তোমার চান্দোলিতে পৌঁছোচ্ছি।

ইতি, তোমার হতভাগ্য বন্ধু

জয়রাম চট্টোপাধ্যায়।"

(ক্রমশ)

ছবি অনুপ রায়

শিকারি

তারাশংকর রায়



টালাপাড়ার টাবলুবাবু
করতে গেলেন শিকার,
বাঘের ডাকে হলেন কাবু--
প্রচণ্ড জ্বর-বিকার।

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮-ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত **জ্ঞাতব্য** বিষয় প্রকাশিত হইল।

১। **প্রকাশস্থান** ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১

২। **প্রকাশকাল** পাক্ষিক

৩। **প্রকাশক** ও **মুদ্রাকর** বাপ্পাদিত্য রায়, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট. কলিকাতা ৭০০০০১

৪। **সম্পাদক** নীরেন্দ্রনাথ **চক্রবর্তী**, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলি-কাতা ৭০০০০১

৫। **যে-সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাহারা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক অংশীদার বা শেয়ার - গ্রহীতা, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা :**

(ক) **মালিক** আনন্দবাজার পত্রিকা লিমি-টেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলি-কাতা ৭০০০০১

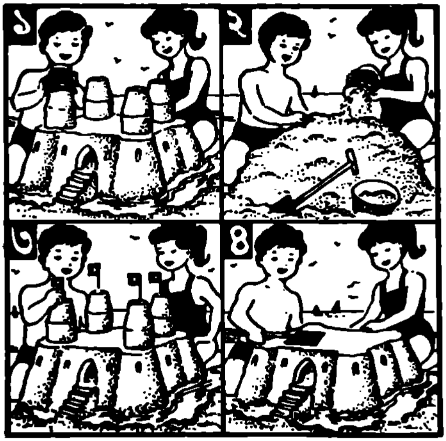
(খ) **মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক শেয়ারগ্রহীতা** অশোককুমার সরকার, অলকা সরকার, অভীককুমার সরকার, অরূপকুমার সরকার, অধীপ-কুমার সরকার, অশনিকুমার সরকার, নাবালক পুত্র অরিন্দমকুমার সরকারের পক্ষে অরূপকুমার সরকার। ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১

আমি বাপ্পাদিত্য রায় এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

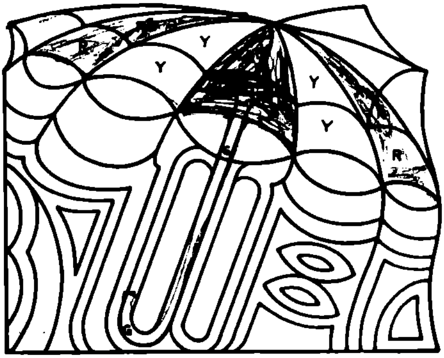
বাপ্পাদিত্য রায়

১ মার্চ ১৯৮০ **প্রকাশক**

ছবির মজা

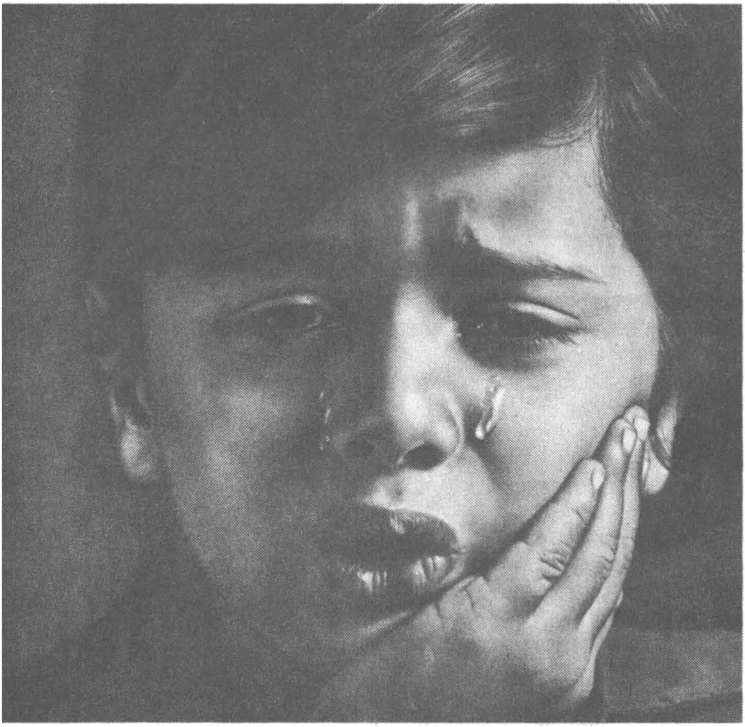


বালি দিয়ে দুর্গ বানাচ্ছে ভাই-বোন। কিন্তু ছবিগুলো উলটোপালটা হয়ে গেছে। তোমরা কি পর-পর সাজিয়ে দিতে পারবে?



ইংরেজি আর-মার্কা **ঘরগুলো লাল** পেনসিলে, ওয়াই-মার্কা **ঘরগুলো হলুদ** পেনসিলে, আর বি-মার্কা **ঘরগুলো নীল** পেনসিলে ভরাট **করলেই চমৎকার একটা** রঙিন ছাতা পেয়ে যাবে।

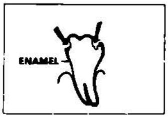
এখন আপনি ওর দাঁত যন্ত্রণাদায়ক ছিদ্রের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন



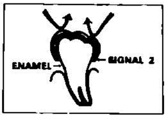
কিনুন সিগন্যাল 2

এতে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্ম্মুলা যা দাঁত মজবুত ক'রে দন্তক্ষয় রোধ করে

দাঁতের ব্যথা শুধু যন্ত্রণাদায়কই নয়—এ দন্তক্ষয়েরও লক্ষণ। অবহেলা করলে ক্ষয় আরও গভীর হবে, পরিণামে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত্তের সৃষ্টি হবে।



সাধারণ টুথপেস্ট গুলো এসিড রোধ করতে পারেনা, যে-এসিড দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করে।



সিগন্যাল 2-তে আছে সবচেয়ে কার্য্যকরী ফ্লোরাইড ফর্মুলা যা মুখের এসিডকে দাঁতের ভেতরে ঢুকে ক্ষয় সৃষ্টি করতে বাধা দেয়।

দন্তছিদ্র রোধ করে

বেশী দেরী হয়ে যাবার আগে এখনই পরিবারের সবাই এমন এক টুথপেস্ট ব্যবহার শুরু করুন যা দন্তক্ষয় রোধ করে ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, আর তা হোল—সিগন্যাল-2। এর বিশেষ ফ্লোরাইড ফর্ম্মুলা দাঁতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দাঁত আরও মজবুত করে, ক্ষতিকারক মুখের এসিডকে আরও ভালভাবে প্রতিরোধ করে—আর দাঁতে গর্ত্ত সৃষ্টি রোধ করতে সাহায্য করে। দন্তক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে আর কোন টুথপেস্টই এর চেয়ে ভাল ফল দেয়না। শুধু আমাদের কথাই মেনে নেবেন না। আপনার দাঁতের ডাক্তারকেও জিজ্ঞেস করুন।



সিগন্যাল 2 ফ্লোরাইডযুক্ত

পরিবারের সবার দাঁতে ছিদ্র রোধ করে।



হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-[illegible]

শব্দ-সন্ধান

১		২	■	৩		৪
	■	৫			■	
৬	৭	■	■	■	৮	
৯			১০			
■		■		■		■
১১		১২	■	১৩		১৪
১৫			■	১৬		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) মেঘ। (৩) প্যাঁচের জন্য বদনাম আছে। (৫) হোম। (৬) যে পাতা শুধু কাঁচাই খাওয়া চলে। (৮) চিহ্ন। (৯) এশিয়ার দীর্ঘতম নদী। (১১) ফলবিশেষ। (১৩) পাঁচ জনকে বোঝায়। (১৫) লাল আভা। (১৬) বস্ত্র।

উপর-নীচ : (১) অবাক জলপান-এর ফল। (২) গভীর ঘূর্ণিজলের জন্য যেখানে কেউ নামতে সাহস করে না। (৩) ঘোড়-সওয়ার, আবার দানবও। (৪) টেবিলের খেলা। (৭) নালা। (৮) শামিয়ানা খাটালে যা হয়। (১০) নিহত এক মুনিপুত্রের নামে কোন্ নদ? (১১) ছেলেবেলায় যা সবচেয়ে ভাল লাগে। (১২) লক্ষ্মী-ঠাকরুন। (১৩) কোন্ বিশেষণ বাড়ির আগেও বসে আবার দাড়ির আগেও বসে? (১৪) ভাই কী হলে দাদা হয়?

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

পি	দি	ম	■	আ	জা	ন
ল	■	ন্দা	■	টা	■	ট
সু	র	কি	■	কা	ল	কা
জ	■	নী	লি	মা	■	ন
■	ব	■	লি	■	স	■
ম	ল্ল	■	পু	■	রা	জা
শা	রি	■	ট	■	ই	তি

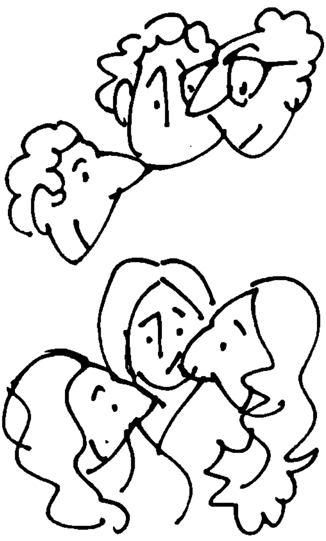
ধাঁধা

জন্মদিনটা ছিল আসলে বাবলির। আমাদের উল্টোদিকের বাড়ির মেয়ে।

বাবলি বললে বাবলি অবশ্য রেগে যায়, বিশেষ করে ওর কলেজের বন্ধুদের সামনে। তখন ওকে বলতে হবে, পারমিতা।

তা হোক। ছোট্‌কা ধাঁধাটা বানিয়েছে বাবলিকে নিয়েই, সুতরাং এই ধাঁধায় ওকে পারমিতা বলছি না, বলছি বাবলি।

বাবলিদের বাড়িতে আরও দুই



বোন থাকে। একজনের নাম লালি, অন্যজনের নাম পিয়ালি। আপন বোন নয়, খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো বোন সব। ওই বাড়িতেই আছে তিন ভাই—অধিপ, সুদীপ এবং প্রদীপ। এদের মধ্যে একজন বাবলির আপন দাদা, একজন লালির, একজন পিয়ালির। কে কার আপন দাদা সেটা এখন বলছি না কিন্তু।

বাবলির জন্মদিনে তিন দাদাই তিন বাক্স চকোলেট কিনে এনেছে। কিন্তু কোনো বিশেষ একজনের জন্য নয়, ভাগ করে দিয়েছে তিন বোনের মধ্যে। শুধু যেটা মনে রাখার ব্যাপার, সেটা হল—কোনো দাদাই তার নিজের বোনকে তার কেনা চকোলেটের বাক্স দেয়নি।

যেমন, অধিপ বাবলিকে দিয়েছে চকোলেটের বাক্স। প্রদীপ তার কেনা চকোলেটের বাক্স দিয়েছে সুদীপের বোনকে। লালির দাদা পিয়ালির হাতে তুলে দিয়েছে এক বাক্স চকোলেট।

এই ব্যাপারটা দেখে ছোট্‌কা তক্ষুনি একটা ধাঁধা বানিয়ে ফেলেছে। ধাঁধাটা হল, ওপরের বর্ণনা থেকে বার করতে হবে, কে কার আপন দাদা।

এটাই এবারের **প্রথম ধাঁধা।**

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ নীচের অক্ষরগুলো কেমন জড়াজড়ি করে ছাপা হয়েছে দ্যাখো। অক্ষরগুলোকে এমনভাবে সাজাও যাতে মানে বোঝা সোজা হয়—ঝাসোজামানেবো

তৃতীয় ধাঁধা ॥ আয়নায় দেখলে মনে হয় ঘড়িতে পৌনে নটা বাজে। **ঘড়িতে আসল সময় তখন কত?**

চতুর্থ ধাঁধা ॥ উপযুক্ত সংখ্যা বসাও—

৯	৪	২
৭	৭	১
৫	৩	?

গতবারের উত্তর ॥ (১) একেবারেই অসম্ভব নয়। ভদ্রলোক যেভাবে চেয়েছেন, সেভাবেই তাঁকে টাকা ভাঙিয়ে দেওয়া যায়। তিনি নিজেও জানেন সেটা, শুধু কেরানিটিকে একটু খেপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মনে হয়। তবে কেরানিটির পক্ষেও কাজ থামিয়ে এমন আবদার রাখা সম্ভব ছিল না। যাই হোক, উত্তর হল—দু-টাকার নোট পাঁচখানা, এক টাকার নোট পঞ্চাশখানা, এবং আটখানা পাঁচ টাকার নোট। এই নিয়ে পুরো একশো টাকা। (২) সতেরো জন লোক ছিল লাইনে। (৩) ১৮ (৩ করে বাড়ছে)। (৪) গিরগিটি।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো



সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল প্যানজি ফুল ও হ্যারিকেনের ফোটো

উত্তর বটে

প্রঃ দৌড়টা আমি ভালই রপ্ত করেছি, কিন্তু সাঁতারটা কিছুতেই শিখতে পারছি না। হঠাৎ যদি জলে পড়ে যাই, তাহলে কী উপায় হবে?

উঃ জলের নীচে মাটি পেয়ে যাবে, তখন এক দৌড়ে পারে গিয়ে উঠে পড়বে।

প্রঃ আমাদের বাগানে ঘাস কাটার জন্যে একটা Lawn mower কেনার কথা হচ্ছে, কোনটা কিনি বলুন তো।

উঃ সস্তায় যদি চাও তো একটা ছাগল কেনো।

প্রঃ একটা কান দিয়েই তো দিব্যি শোনা যায়, ভগবান আমাদের দুটো কান কেন দিয়েছেন?

উঃ ভাল ভাল উপদেশ যাতে একটা কান দিয়ে ঢুকে আর-একটা কান দিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে যেতে পারে।

প্রঃ পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট খেলায় ভারত তো এবার রাবার পেল, এবার কী করা উচিত?

উঃ আগেকার খারাপ খারাপ স্কোরগুলি রাবার দিয়ে তুলে দেবে।

সুসেন

মজার খেলা

এ-খেলার জন্য চাই দশটা দুই পয়সা। অন্য পয়সা হলেও চলবে, তবে একই রকমের দশটা হওয়া চাই।

পয়সা দশটা কোনো বন্ধুকে দাও। এবার তাকে বলো, এমন পাঁচটা সরল রেখায় সাজাতে হবে পয়সাগুলো যাতে প্রত্যেক লাইনে চারটে করে পয়সা থাকে।

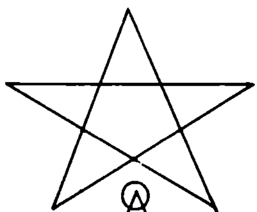
অর্থাৎ পাঁচটা লাইন হবে, প্রত্যেক লাইনে থাকবে চারটে করে পয়সা। শুনলেই কেমন অসম্ভব লাগে কানে, কারণ সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, কুড়িটা পয়সা লাগবে।

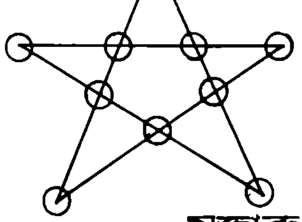
আসলে কিন্তু মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। চালাকি রয়েছে সামান্য। সাজানোর নিয়মটা জেনে নেওয়ার পর দেখবে কী সোজা অথচ কী মজার ব্যাপার।

সুতরাং নিয়মটা শিখে ফেলো চটপট।

নীচের ছবির মতো একটা তারা এঁকে ফেলো। তারপর পাশের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে তেমনভাবে পয়সাগুলো বসাও।

দেখবে পাঁচটা সোজা লাইন, প্রত্যেক লাইনে রয়েছে চারটে করে পয়সা। অথচ দশটা পয়সাতেই সাজানো সম্ভবপর হল।





মজারু

হাসিখুশি



রাম : বাবা, কালির দাম কি খুবই বেশি?

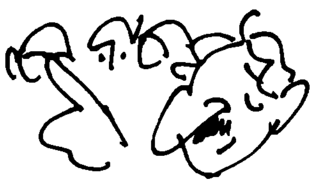
বাবা : না, ছোট এক শিশি কালি এক টাকায় পাওয়া যায়।

রাম : তবে মাত্র তিন শিশি কালি বিছানায় ফেলতে মা অমন হৈ-হল্লা বাধিয়ে দিয়েছে কেন?



বিজ্ঞানের ক্লাসে শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন : জল যখন বরফ হয় তখন সবচেয়ে বড় পরিবর্তন কী লক্ষ করা যায়?

ছাত্র : দামে সস্তা।



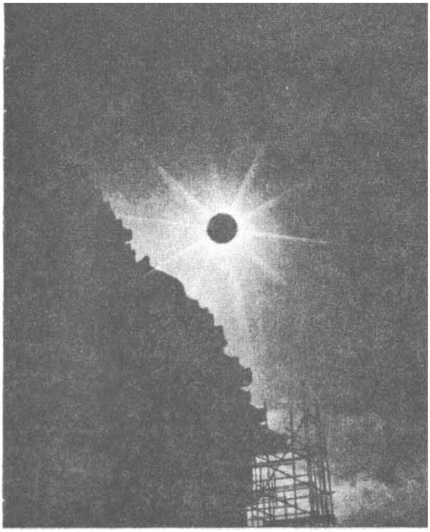
কোন-এক স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেল, নবম শ্রেণীর অধিকাংশ ছেলে সব বিষয়ে পাস-নম্বর তুলেও এগ্রিগেটে ফেল করে গেছে। স্কুল কমিটির জরুরি সভা বসল। স্কুলের সম্পাদক নিজেই এক ম্যাট্রিক-ফেল। সব শুনে-টুনে তিনি প্রধান শিক্ষককে বললেন, "এত বড় ইস্কুলে এত মাস্টার, অথচ এগ্রিগেটের কোনো মাস্টার নেই কেন আমি বুঝতে পারছি না। আমি চাই অবিলম্বে এগ্রিগেটের একজন ভাল মাস্টার নিয়োগ করা হোক।"

ছবি অহিভূষণ মাল্লিক



amc/apddc/254/79 D

গ্রহণ-রহস্য



গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি যে সূর্যগ্রহণ হয়ে গেল ভারতের অনেক জায়গা থেকেই তা দেখা গিয়েছিল। কোথাও পূর্ণ গ্রাস দেখা গিয়েছিল, কোথাও বা আংশিক। কোনারকের সূর্য-মন্দিরের নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ। এই মন্দিরে দেশ-বিদেশের অনেক বৈজ্ঞানিক জড়ো হয়েছিলেন সূর্যের পূর্ণগ্রাস দেখবার জন্যে।

পৌরাণিক মতে রাহু সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করে ফেলে বলেই সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয়। ব্যাপারটা কী হয়েছিল জানো? সমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত উঠেছিল সেটা দৈত্য রাহু দেবতাদের সঙ্গে বসে পান করছিল। সূর্য ও চন্দ্র তা দেখে ফেলে বিষ্ণুকে বলতেই বিষ্ণু চক্র দিয়ে রাহুর মাথাটা কেটে ফেললেন। অমৃত পান করলে অমরত্ব লাভ করা যায়—সেইজন্যে রাহুর মাথাটার মৃত্যু হল না এবং এর ফলে রাহুর সঙ্গে সূর্য ও চন্দ্রের শত্রুতার সৃষ্টি হল। সুযোগ পেলেই রাহু চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করে এবং তারই ফলে হয় সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ।

কিন্তু এটা তো গেল পৌরাণিক উপাখ্যান। গ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে। পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে একই সরলরেখায় চন্দ্র এসে গেলে চন্দ্রের ছায়া যখন সূর্যের ওপর পড়ে তখন সূর্য চন্দ্রের ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়—এরই ফলে হয় সূর্যগ্রহণ। সূর্যগ্রহণের সময় সম্পূর্ণ সূর্য বা সূর্যের খানিকটা অংশ ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়। অমাবস্যা তিথিতেই সূর্যগ্রহণ হয়। চন্দ্রগ্রহণ হয় পূর্ণিমা তিথিতে। সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র একই সরলরেখায় অবস্থান করলে পৃথিবীর ছায়াটা চন্দ্রের ওপর পড়ে। এরই ফলে হয় চন্দ্রগ্রহণ। গ্রহণের সময় পূর্ণ চন্দ্র বা তার খানিকটা অংশ ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়।

সম্পূর্ণ সূর্য ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেলে তাকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ বলা হয়। ছায়ার চারদিকে যদি একটা বলয়ের মতো সূর্যের আলো দেখা যায় তাকে বলয়গ্রাস বলা হয়। আর যদি সূর্যের সামান্য অংশ চন্দ্রের ছায়ায় আবৃত হয় তাকে খণ্ডগ্রাস বা আংশিক সূর্যগ্রহণ বলা হয়। কোনো সূর্যগ্রহণই পৃথিবীর সব জায়গা থেকে দেখা যায় না। কোনো একটি জায়গা থেকে পূর্ণগ্রাস বা বলয়গ্রাস বহু বছর পরে দেখা যায় কিন্তু খণ্ডগ্রাস প্রায়ই দেখা যেতে পারে। এক বছরে সাতবার গ্রহণ হতে পারে। ১৯৩৫ সালে পাঁচবার সূর্যগ্রহণ এবং দুবার চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। ১৯৮২ সালে চারবার সূর্যগ্রহণ এবং তিনবার চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং ১৯৮০ সালে সূর্যগ্রহণ একবার ১৬ ফেব্রুয়ারিতে হয়ে গেল, আরেকবার হবে ১০ আগস্ট। এই গ্রহণটি দেখা যাবে দক্ষিণ আমেরিকায় এবং প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যভাগে।

গত শতাব্দীতে ভারতে পাঁচবার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়ে গেছে—১৪ এপ্রিল ১৮২৮ সালে, ২০ ডিসেম্বর ১৮৪৩ সালে, ১৭ আগস্ট ১৮৬৮ সালে, ১২ ডিসেম্বর ১৮৭১ সালে এবং ২২ জানুয়ারি ১৮৯৮ সালে।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় রাত্রি হয়েছে ভেবে পাখিরা বাসায় ফিরে যায় এবং পশুরাও বিশ্রাম নিতে আরম্ভ করে। আকাশে আবার সূর্য দেখা দিলে তারা খুবই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণে কিন্তু কখনই রাত্রির মতো অন্ধকার নেমে আসে না—সূর্য ওঠবার এক ঘন্টা আগে বা সূর্যাস্তের এক ঘন্টা পরে যতটা আলো থাকে ততটা আলো আকাশে দেখা যায়। অনেক সময় আকাশে দু একটি তারাও দেখতে পাওয়া যায়।



নুনের গুণ

হিমাদ্রি লাহিড়ী

বাবা বললেন, "তোদের ওই শ্যামকাকা অসুখ সারানোর নাম করে গ্রাম থেকে এখানে এসেছিল। সব বাজে কথা—কলকাতা শহরে রোজ খুব মজাসে থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখে বেড়াচ্ছে আর আড্ডা দিয়ে দিয়ে তোদের পড়াশুনোর ব্যাঘাত করছে। ওকে কৌশলে এ-বাড়ি থেকে হঠানো যাচ্ছে না— অথচ সোজাসুজি বলাও যাচ্ছে না।"

শ্যামকাকা আসলে ওদের নিজের কাকা নন, গ্রাম-সম্পর্কে কাকা, খুবই দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ও হন। রঘু আর বিটুও তা জানত, কিন্তু বাবা যে তাঁর থাকা পছন্দ করছেন না তা তারা জানত না।

রঘু আর বিটু চুপ করে রইল। বাবা বললেন, "যদি খুব কৌশলে ওকে সরাতে পারিস এ-বাড়ি থেকে তাহলে দুজনকে দুটো চমৎকার ফাউনটেন পেন কিনে দেব।"

রঘু আর বিটু এ কথায় দারুণ উৎসাহিত হয়ে উঠল আর পরামর্শ করতে লাগল কী-ভাবে শ্যামকাকাকে বাড়ি থেকে কৌশল করে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়।

অনেক ভেবেচিন্তে রঘু বলল, "আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। আজ রাত্রে আমরা যখন একসঙ্গে খেতে বসব তখন ডালে খুব নুন হয়েছে, খাওয়া যাচ্ছে না বলে আমি চেঁচিয়ে উঠব।"

বিটু বলল, "তাতে কী সুবিধে হবে?"

রঘু বলল, "শোন না বাকিটা, তারপর মন্তব্য করবি। আমি যখন বলব, খুব নুন হয়েছে ডালে তখন তুই বলবি, কোথায় নুন বেশি হয়েছে, বরং নুন কমই হয়েছে। আরও নুন দিতে হবে। তখন আমি বলব, তুই কচু বুঝিস। তখন তুই খুব চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবি, তারপর আমি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করব। এই সময় আমি জিজ্ঞেস করব শ্যামকাকাকে, শ্যামকাকা, তুমি বলো তো ডালে নুন কম হয়েছে, না বেশি হয়েছে? শ্যামকাকা যদি বলে কম হয়েছে তাহলে আমি রেগে যাব—মানে, প্রচণ্ড রেগে যাওয়ার ভান করে সমস্ত ডালের বাটিটা তার মাথায় ঢেলে দেব। আর যদি শ্যামকাকা বলে নুন বেশি হয়েছে তাহলে তুই রেগে যাওয়ার ভান করে এক বাটি ডাল শ্যামকাকার মাথায় ঢেলে দিবি। আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করবি, মানে যাচ্ছেতাই গালাগাল আর অপমান করবি। এ-রকম করলে শ্যামকাকা সম্মান বজায় রাখার জন্য এ-বাড়ি থেকে চলে যাবে।"

সেদিন রাত্তিরবেলা খেতে বসে ডালটা একটু চেখেই রঘু বলল, "এঃ, এত নুন দিয়েছ কেন মা, খাওয়া যাচ্ছে না!"

বিটু সঙ্গে সঙ্গে একটু ডাল খেয়ে বলল, "কোথায় বেশি নুন—আরও নুন দেওয়া দরকার। তারপর কথা মতো তারা দুজনে তর্কাতর্কি শুরু করল। শেষে বিটু জিজ্ঞেস করল, "বলো তো শ্যামকাকা, নুন কম হয়েছে কি বেশি হয়েছে?"

রঘুও বলল, "হ্যাঁ, তুমি বলো।"

শ্যামকাকা ডালের বাটি থেকে একটু ডাল নিয়ে মুখে দিয়ে বললেন, "আমার পক্ষে চমৎকার হয়েছে।"

বলে চুপচাপ খেতে লাগলেন শ্যামকাকা।

ছবি দেবাশিস দেব



খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ৩৮ ॥

ইডেনে সি এ বি একাদশের সঙ্গে উরস্টার কাউন্টি দলের খেলার কথা মনে পড়ছে। ইংল্যান্ডের কাউন্টি চ্যাম্পিয়ন উরস্টার দলে ছিলেন আট-নয়জন টেস্ট ক্রিকেটার। যেমন—ডন কেনিয়ন, টম গ্রেভনি, লেনার্ড কোল্ডওয়েল, বেসিল ডলিভেরা, মার্টিন হর্টন, লেস ফ্ল্যাভেল, রন হেডলি, ডেরেক রিচার্ডসন ও নর্মান গিফোর্ড।

অল্পসময়ের ব্যবধানে আমি পর-পর দুটি উইকেট পেয়ে মহাখুশি। অধিনায়ক ডন কেনিয়ন আমার ইন-সুইঙ্গার ডিপ ফাইন-লেগে ক্যাচ দিয়ে বিদায় নিলেন। রন হেডলিও ঠকে গেলেন আর-একটি ইন-সুইঙ্গারে। অবশ্য হেডলির কাছে ওটি ছিল আউট-সুইঙ্গার। কারণ হেডলি বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান। তাঁর ব্যাট ছুঁয়ে স্লিপে নিচু ক্যাচ যেতেই অম্বর রায় চমৎকারভাবে সেটি ধরে নিয়েছিল। রন হেডলি কে জানো? ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিখ্যাত খেলোয়াড় জর্জ হেডলির পুত্র। অসাধারণ ব্যাটিং-দক্ষতার জন্য জর্জ হেডলিকে বলা হত ব্ল্যাক ব্র্যাডম্যান।

রান আউট হবার পর খেলতে এলেন টম গ্রেভনি। তখনকার মস্ত বড় ব্যাটসম্যান। ইডেনের পিচে তখন কিছু ঘাস থাকত। সুইং বোলাররা পিচ থেকে সাহায্য পেত। আমি সেদিন বলও করছিলুম ভাল। কিন্তু গ্রেভনিকে ক্রিজে আসতে দেখেই আমার মুখ শুকিয়ে গেল। ভাবলুম এবার তাঁর ব্যাটের ঘায়ে বল ছাতু হয়ে যাবে।

বোধহয় আমার ভাবটা বুঝতে পেরে আমাদের অধিনায়ক পঙ্কজ রায় একটু অদল-বদল করে ফিল্ড সাজাতে আরম্ভ করলেন। অম্বরকে আনা হল স্লিপ থেকে গালি পজিশনে। আর দু' একজনের পজিশনও বদল করা হল। এটা ক্রিকেটের একটা চাল। সামান্য একটু অদল-বদলে বোলারের আত্ম-বিশ্বাস বাড়ে। ব্যাটসম্যান ভাবতে থাকে, কেন ফীল্ডার বদল করা হচ্ছে। মনের উপর একটু চাপ সৃষ্টি আর কী।

সে-ওভারটিতে গ্রেভনি আমাকে পড়ে নিলেন। পরের ওভারে আমি একটি আউট-সুইঙ্গার দিলুম। বলটি ছিল অফ-স্টাম্পের উপর একটু খাটো লেংথের। গ্রেভনি বোধহয় ব্যাক-ফুটে খেলতে চেয়ে-ছিলেন। পরে মত বদল করে দুর্দান্তভাবে স্কোয়ারকাট করলেন। শটটিতে এত শক্তি ছিল যে, আমরা ভেবেছিলুম বল বুঝি নিচু হয়েই মাঠ পেরিয়ে গিয়ে গ্রেভনিকে ছয় রান দেবে। কিন্তু অবাক চোখে দেখলুম, অম্বর ঘাসের উপর গড়িয়ে পড়ে দু'হাত উঁচু করে আছে। তার মুঠোয় ধরা রয়েছে গ্রেভনির 'প্রাণ'। অত বড় ব্যাটসম্যানের উইকেটটি পেয়ে তখন আমার কী যে আনন্দ হয়েছিল, আজ লিখে বোঝাতে পারব না। আমি অম্বরকে অভিনন্দন জানাবার জন্য ছুটে যাচ্ছি, গ্রেভনিও ক্রিজ ছেড়ে প্যাভিলিয়নের দিকে পা বাড়িয়েছেন। একটু বাঁকা পথে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ইংরাজিতে বললেন, "ডোন্ট ক্লেম দ্যাট দিস ইজ ইওর উইকেট। ইট ইজ হিজ"—বলেই অম্বরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলেন। আমরা সকলেই হো-হো করে হেসে উঠলুম।

গ্রেভনির কথায় রসিকতা যাই থাক, সত্যিই তো অম্বরের ওই অসাধারণ ক্যাচেই আমার উইকেট। এই অম্বর রায় সম্পর্কে আমি বলব—ট্যালেন্টেড বাট নেগলেক্টেড ব্যাটসম্যান। সত্যিই দারুণ ট্যালেন্টেড ছিল। বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান বলে বাড়তি সুবিধাও ছিল। চমৎকার ফীল্ড করত যে-কোনো পজিশনে। চারটি টেস্টে তার রান যোগ্যতার যথার্থ পরিচয় নয়। সাধে কি আর সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ক্রিকেট-লেখক নেভিল কার্ডাস স্কোর বোর্ডকে 'গাধা' বলে গেছেন। স্কোরবোর্ডের রান দেখে তো রানকারী ব্যাটসম্যানের হাতের শিল্প-সুষমার পরিচয় মেলে না। টেস্টে-করা রানের মধ্যেও অম্বরকে আমরা খুঁজে পাব না। কিছুটা পাব কিন্তু বিজ্ঞ ক্রিকেটারদের মন্তব্যের মধ্যে। উনসত্তরে নাগপুরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জীবনে প্রথম টেস্টে অম্বরকে ৪৮ রান করতে দেখে লালা



পঙ্কজ রায়

অমরনাথ ও বিজয় মার্চেন্ট অসম্ভব প্রশংসা করেছিলেন। তাও অম্বর খেলতে নেমেছিলেন ১৬৯ রানের মধ্যে সাতটি উইকেট পড়ে যাবার পর। সে বছর বিজয় মার্চেণ্ট ছিলেন নির্বাচক সমিতির চেয়ার-ম্যান। বেশ-কিছু তরুণ খেলোয়াড়কে নেটে ডেকেছিলেন। খেলারও সুযোগ দিয়েছিলেন। অম্বরের ব্যাটিং দেখে বলেছিলেন, "ভারতীয় ক্রিকেটে এক প্রতিভাবান ন্যাটা ব্যাটসম্যানের উদয় ঘটল। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে পরের টেস্টে এবং ওই বছর অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে দুটি টেস্টে ভাল রান করতে না-পারায় আর টেস্ট খেলার আসরে ডাক পড়েনি অম্বরের। তার সম্বন্ধে আমার এইটুকুই বলার যে, কাকা পঙ্কজ রায়ের মতো সাধনা থাকলে অম্বর অনেক উপরে উঠতে পারত। আমার অধিনায়কত্বে অম্বর অনেক সুন্দর ইনিংস খেলেছে। ওর হাতের স্ট্রোক দেখে আমি অনেক সময় ভেবেছি, আমার যদি ওর মতো ট্যালেন্ট থাকত, নির্ঘাত আমি টেস্ট খেলতুম।

আগেই লিখেছি, ফুটবল থেকে আস্তে-আস্তে আমি সরে যাচ্ছিলুম। ক্রিকেটেরই টানে। পঁয়ষট্টি ও ছেষট্টিতে প্রচুর ক্রিকেট খেলেছি। উরস্টারের সঙ্গে খেলার আগে শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়েছিলুম স্টেট ব্যাঙ্ক দলের সঙ্গে। স্টেট ব্যাঙ্ক টীম, কিন্তু টেস্ট টীমও বলা যায়। আমি ছাড়া দলে আর কারা ছিল দ্যাখো। হনুমন্ত সিং, অজিত ওয়াড়েকর, বিজয় মেহেরা, বুধি কুন্দেরন, রমেশ সাক্সেনা, রাজেন্দ্র গোয়েল, ভি ভি কুমার, দিওয়াদকর প্রভৃতি। তখন ওয়াড়েকারের চেয়েও হনুমন্তের নাম ছিল বেশি। সিনিয়র খেলোয়াড়ও। তাই হনুমন্ত ছিল আমাদের অধিনায়ক।

শ্রীলঙ্কায় আমরা বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলেছিলুম। গলে, কলম্বোয় এবং কয়েকটি চা-বাগানের মাঠে। প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়কের একাদশের সঙ্গে বে-সরকারী টেস্ট নামে একটি খেলা হয়েছিল কলম্বোতে। খেলাটি শুরুর আগে আমরা সার বেঁধে দাঁড়ালুম। বন্দরনায়ক এগিয়ে এসে সবার সঙ্গে করমর্দন করতে আরম্ভ করলেন। আমার কাছে এসেই হাতে জোরে চাপ দিয়ে বললেন, "ওয়েল, আই অ্যাম ভেরি হ্যাপি টু সী ইউ ব্যাক ইন দি গেম।" আমি বুঝতে পারলুম না, কেন তিনি 'ব্যাক ইন দি গেম' কথাটি বললেন। বুঝলুম পরে, লাঞ্চ টাইমে। পুস্তিকায় আমাদের সকলের পৃথক ছবির সঙ্গে যে পরিচিতি ছিল, তা থেকেই তিনি বুঝেছিলেন যে, প্রি-অলিম্পিক ফুটবলে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আমি ছিলুম ভারতের অধিনায়ক এবং খেলার মধ্যে দারুণ চোট পেয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলুম। সত্যিই তখন আমি জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে। সেই আমি আবার খেলছি দেখে বন্দরনায়ক ওই কথা বলেছিলেন।

ছেষট্টির একটি ছোট খেলার কথাও মনে পড়ছে। ছোট খেলা মানে সি এ বি নক-আউটের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা।

খেলার পরের দিন একটি কাগজের খেলার পাতায় শিরোনামা ছিল : "ক্রিকেটে ফুটবলারের হ্যাটট্রিক এবং অবিশ্বাস্য অ্যাভারেজ"। হেডিংয়ের নীচেই দেওয়া হয়েছিল বোলিংয়ের হিসাব। সে হিসাবটি এইরকম :

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
২·৩	২	৪	৬
			(হ্যাটট্রিক সহ)

কাদের বিরুদ্ধে পেয়েছিলুম জানো? স্যার গুরুদাস ইনস্টিটিউটের বিরুদ্ধে। ৪৪ মিনিটের মধ্যে মাত্র ২৫ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল স্যার গুরুদাসের ইনিংস। দশ

উইকেটে জিতে মোহনবাগান কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল।

ছেষট্টি-সাতষট্টির মরসুমে আমার এক স্মরণীয় ক্রিকেট খেলা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিরুদ্ধে। সেবারের সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলার সংখ্যা কম ছিল। তাই ঠিক হয়েছিল পূর্বাঞ্চল বা মধ্যাঞ্চলের সঙ্গে পৃথক-পৃথক ম্যাচ না হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে সম্মিলিত পূর্বাঞ্চল-মধ্যাঞ্চল দলের খেলা হবে ইন্দোরে।

পূর্বাঞ্চল খেলোয়াড়দের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য বাংলা-বিহার রঞ্জি ট্রফির ম্যাচটিকে কষ্টিপাথর হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছিল। শুধু পূর্বাঞ্চল দলের সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খেলা হলে আমার অবশ্যই নির্বাচিত হবার স্বর্ণসম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মধ্যাঞ্চলের খেলোয়াড়রাও যখন দলে আসবে তখন আমার খেলার কোনো আশা ছিল না। যাই হোক. বিহারের বিরুদ্ধে রঞ্জির খেলায় পঞ্চাশের উপর রান এবং কয়েকটি উইকেট পাওয়ায় অল-রাউন্ডার বিবেচনায় আমি দলে ঢুকে যেমন খুশি হলুম, তেমন দুঃখও পেলুম নামী ব্যাটসম্যান শ্যামসুন্দর মিত্র দল থেকে বাদ পড়ায়। শ্যামসুন্দর বিহারের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছিল। খেলত আমাদের মোহন-বাগানে। শ্যামসুন্দর দলে নেই, অথচ আমি আছি, ব্যাপারটা আমার পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল।

তোমরা কি আজ বিশ্বাস করবে সোবার্স-কানহাই - হল - কিং - গ্রিফিথ - লয়েড-নার্স-মারের তারকাখচিত ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে আমরা হারিয়ে দিয়েছিলুম? এবং হারিয়েছিলুম ইনিংসে?

শ্যামসুন্দরকে দল থেকে বাদ দেওয়ায় আমি যে অস্বস্তিতে ভুগছিলুম, সেটা কিন্তু কেটে গিয়েছিল খেলতে-খেলতেই।

দুই ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের কুড়িটি উইকেটের মধ্যে সুব্রত গুহ এবং আমি পেয়েছিলুম উনিশটি—সুব্রত এগারোটি, আমি আটটি। প্রথম ইনিংসেই পেয়েছিলুম পাঁচটি উইকেট। রান অবশ্য বেশি করতে পারিনি। মাত্র আঠাশ।

ওই খেলার দুই-একটি ঘটনার কথা বলি। প্রথম ইনিংসে আমি বল করছি বিখ্যাত রোহন কানহাইয়ের বিরুদ্ধে। কানহাইকে মনে মনে গুরু ভেবে নিয়েই তো গাভাসকার তার ছেলের নাম রেখেছে রোহন। কানহাই লেগ স্টাম্পে গার্ড নিয়েছেন। লেগ স্টাম্প গার্ড করেই খেলতেন। দুটি বল খেলেই আম্পায়ারের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "হেল উইথ ইট, দি ইন্ডিয়ান বলস আর সুইংগিং টু উ মাচ। গিভ মী দি অফ স্টাম্প।" কানহাইকে অফ স্টাম্পে গার্ড নিতে দেখে অধিনায়ক হনুমন্ত সিং আমার কাছে এসে বলল, "দ্যাখো চুনীদা, কানহাই লেগ সাইডে দারুণ স্ট্রং। সুইপ শট চাবুকের মতো। তোমার ইনসুইংগারগুলিকে বলে-বলে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দেবে।" আমি একটু হেসে বললুম, "তাহলে কি আমি গালি পজিশন দিয়ে বল করব? নোবল থেকেই ওদের রান বাড়ুক।" হনুমন্ত বলল, "না, না, তা কেন, তুমি তোমার মতোই বল করো।"

সেদিন বেশ জোরেই হাওয়া বইছিল। তার ফলেই সুব্রত এবং আমি বলে ভাল বাঁক



চুনী (উইকেটের সামনে)

নেওয়াতে পেরেছিলুম। কানহাইকে তাঁর নিজমূর্তিতে দেখা যায়নি। সতর্ক হয়ে ছোট-ছোট স্ট্রোক করছিলেন মিডসার্কেলের মধ্য দিয়ে। তারই মধ্যে আমার বলে গালিতে সহজ ক্যাচ দিয়ে বিদায় নিলেন।

ইন্দোরে আমি ও সুব্রত এক রুমে থাকতুম। সুব্রতর বলে তোলা লেস্টার কিংয়ের ক্যাচটি আমি ধরার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের উপর যবনিকা পড়েছিল। আমাদের জয় হয়েছিল ইনিংসে। কিংয়ের ক্যাচটি কঠিন ছিল না। কিন্তু সুব্রতর বলেই ওয়েসলি হলের আকাশে তোলা ক্যাচটি ধরার জন্য যদি আমি কৃতিত্ব দাবি করি, তাহলে, ধারণা, নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে সে-কৃতিত্ব দেবে।

কীভাবে ক্যাচ ধরেছিলুম শোনো। আমি ফীল্ড করছিলুম ডীপ মিড-অনে। হলের ক্যাচটি উঠেছিল ডীপ স্কোয়ার-লেগ অঞ্চলের আকাশে। দূরত্বটা তোমরা কল্পনা করে নিতে পারছ। আমি দৌড়তে আরম্ভ করলুম স্প্রিন্টারের মতো, বলের দিকে লক্ষ রেখে। বল অত উপরে উঠেছিল বলেই নাগাল পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। তাও দু' হাতে বল পাইনি। দৌড়তে দৌড়তেই ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিলুম বলের নীচে। ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতোই বল হাতে এসে জমে গেল। চল্লিশ হাজার দর্শকের হাততালিতে তখন কানে তালা-লাগার অবস্থা। আনন্দ-রোলের রেশ ছিল অনেকক্ষণ।

চোদ্দ বছর আগের ঘটনা, কিন্তু ইন্দোরের কারো-কারো মন থেকে ওই ক্যাচের স্মৃতি এখনো মুছে যায়নি। কিছু-দিন আগে ইন্দোরে গিয়েছিলুম ব্যাঙ্কের কাজে। ওখানে মেডিক্যাল কলেজের অ্যাথ-লেটিক স্পোর্টসে প্রধান অতিথি করে আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল। প্রিন্সিপ্যাল তাঁর ছাত্র ও দর্শকদের কাছে আমার পরিচয় দিতে গিয়ে ফুটবলের নানা কথা তো বললেনই, বিশেষ করে বললেন, চোদ্দ বছর আগের ওই ক্যাচটির কথা।

ক্যাচটি গারফিল্ড সোবার্সের মনকেও তখন হয়তো নাড়া দিয়েছিল। ঘটনাটি মনেও রেখেছিলেন। তাই পরে তাঁর বইতে আমার ওই ক্যাচের কথা উল্লেখ করেছেন। (ক্রমশ)

॥ জলসরবরাহ ॥

হঠাৎ যদি ২।১ দিন যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য জলের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, তখন নিশ্চয়ই তোমাদেরও জলের সম্বন্ধে টনক নড়ে ওঠে। কেন বন্ধ, কতক্ষণ বন্ধ, কোথায় বন্ধ এসবই মনে আসে তো ?

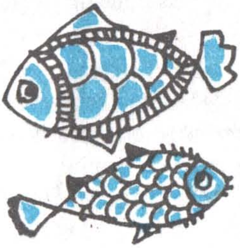
তাহলে আজ জলের কথাই বলি। কলকাতার যাবতীয় পরিশুদ্ধ জল সরবরাহ করছে টালার ট্যাঙ্ক। এই ট্যাঙ্কে পলতা থেকে জল এসে জমা হয়। টালা-পলতার বয়স কিন্তু একশ বছরেরও ওপর।

এই মান্ধাতার আমলের ট্যাঙ্ক মাঝে মাঝে যে অকেজো হবে এ আর বলার কি আছে ? তাছাড়া যন্ত্র তো বিগড়োতেই পারে। তাই সি, এম, ডি, এ মাটির নীচে আরও দুটো বিশাল বিশাল জলাধার তৈরী করছে। একটা হচ্ছে অকল্যাণ্ড স্কোয়ারে (৬০ লক্ষ গ্যালন) আর একটা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে (৬০ লক্ষ গ্যালন)। এ দুটো শীগগীরই চালু হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে পরিশুদ্ধ জল টালা ট্যাঙ্ক ছাড়াও আরও দুটো ভূগর্ভস্থ জলাধারে জমা হতে পারবে এবং জলের সাপ্লাই মোটামুটি ভাবে চালু থাকবে। আর ২।১ বছরের মধ্যেই গার্ডেনরীচ আর হাওড়ায় জল প্রকল্পগুলি চালু হলে অবস্থাটা আরও অনেক ভাল হবে। অকল্যাণ্ড স্কোয়ারে যে জলাধারটা হয়েছে তার ওপরে একটা ছোটদের জন্য পার্ক করা হয়েছে। এই পার্কে আর সমস্ত পার্কের মতই থাকছে গাছপালা, খেলাধুলোর সরঞ্জাম, সুইমিংপুল। কিন্তু তার চেয়েও বড় আকর্ষণ হচ্ছে এখানকার গল্প-বলা ছবিগুলো। আবোল-তাবোল আর কথামালার গল্প এগুলো। লা-মার্টিনিয়ার স্কুলের ঠিক পিছনেই এই পার্কটা তৈরী হচ্ছে। তোমরা কিন্তু দেখতে এস। কেননা তোমাদের জন্যই তো এটা তৈরী করা হচ্ছে।

(সি, এম, ডি, এ জনসংযোগ বিভাগ, ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

নামতার ছড়া



দুই এককে দুই,
ইলিশ আর রুই।
দুই দুগুনে চার,
সোনা-রুপোর হার।
তিন দুগুনে ছয়,
সন্ধ্যাবেলায় ভয়।
চার দুগুনে আট,
ভুবনডাঙার মাঠ।
পাঁচ দুগুনে দশ,
টমেটোর সস।
ছয় দুগুনে বারো,
ফুচকা খাব আরো।

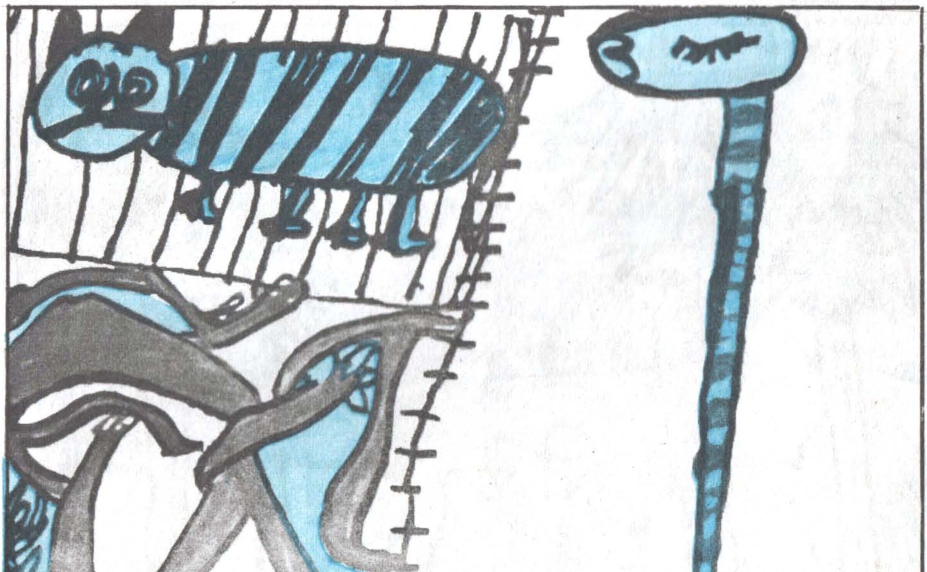
নন্দনা রায়চৌধুরী (বয়স ৭)

দুই ভাই



দেবা গবা দুই ভাই
খালি বলে চাই চাই।
মাছ মাংস পোলাও কাবাব
প্রতিদিন করে সাবাড়।
ঘুম পেলে শুয়ে পড়ে
এমনি করে দিন চলে—
ওদের বাবা গঙ্গারাম
বছরশেষে রাঁচি যান।
মায়ের নাম হাসিরাশি
গল্প শোনান রাশি-রাশি

শরদিন্দু ঘোষ (বয়স ৭)



ছবি এঁকেছে সর্বাণী ঘোষ (বয়স ৭)

আমি একা



আমার মা এখন হাসপাতালে। বাবা অফিসে। আমি কলকাতা থেকে অনেক দূরে থাকি। সামনে আমার পরীক্ষা। কিন্তু, পড়তে বসলে আমার মন পড়ে থাকে বাবা ও মায়ের দিকে। পড়তে ভাল লাগে না।

অনেক সময় আমি কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ি। ভাবি, কবে যে রবিবার আসবে ! রবিবারে বাবা এসে অনেক গল্প বলবে আমাকে।

রাজীবেন্দ্রনাথ দাশ (বয়স ৮)

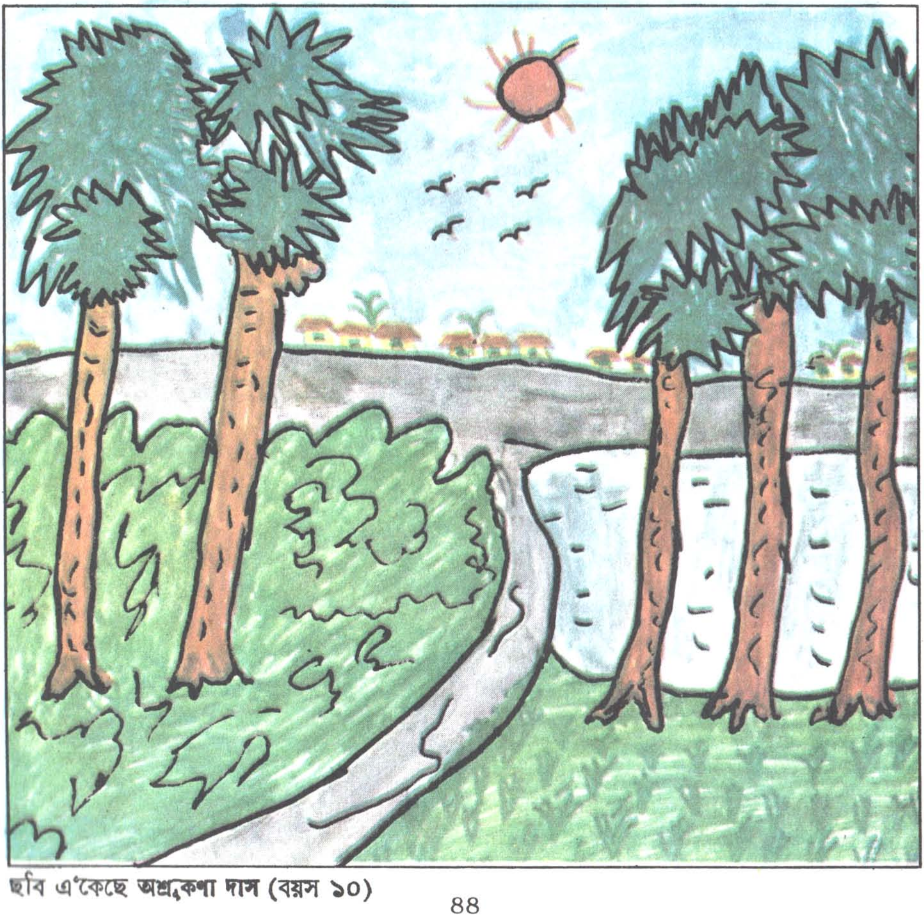
ছুটিতে দীঘা



এবার গরমের ছুটিতে দীঘা বেড়াতে গিয়েছিলাম। সমুদ্রের ধারে গিয়ে খুব মজা লাগছিল। সমুদ্রে মস্ত বড়-বড় ঢেউ উঠছিল একটার পর একটা।

রোজ ভোরবেলা ঝিনুক কুড়োতাম। অনেক লাল কাঁকড়া দেখেছি। পায়ের আওয়াজ পেলেই কাঁকড়াগুলো বালির গর্তের মধ্যে ঢুকে যেত। প্রতিদিন সমুদ্রে চান করতাম। আসার সময় খুব খারাপ লাগছিল।

প্রদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৮)



ছবি এঁকেছে **অশ্রুকণা দাস** (বয়স ১০)

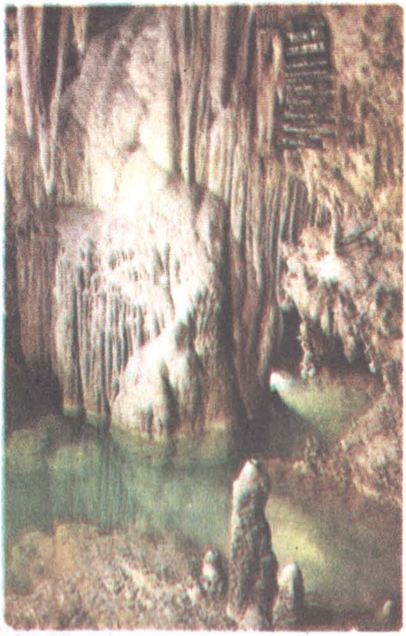
লুরে ক্যাভার্ন

নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য

শিল্পীমাত্রেই খেয়ালি। পাঁচটা-দশটা সাধারণ মানুষের মতো একান্ত নিয়মনির্ভর নন তিনি। প্রকৃতিও এক মস্ত বড় শিল্পী। তিনি নানা রঙের ছবি আঁকেন আকাশে, মাঠে, পাহাড়ে, জঙ্গলে, সাগরে, খালেবিলে। এই বিরাট শিল্পীর কাছে মানুষ বহুভাবে অনুপ্রেরণা পায়। মানুষের খেয়ালের মতো প্রকৃতিরও খেয়াল আছে। সবসময় সেই খেয়ালের অর্থ আমরা বুঝি না—যেমন বুঝি না কেন এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গ ঊনত্রিশ হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু হল; কিংবা প্রশান্ত ও অতলান্তিক মহাসাগর কেন কোথাও কোথাও পঁচিশ হাজার ফুটের বেশি গভীর।

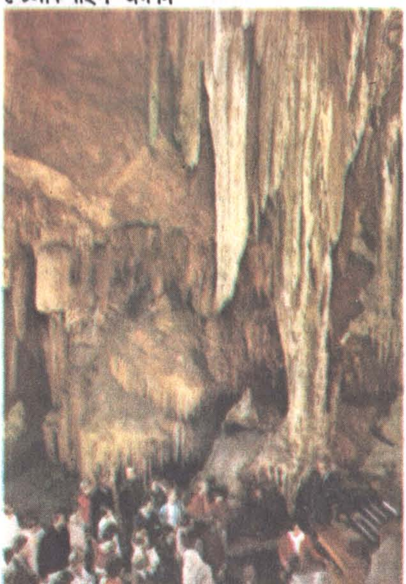
মানুষ তাই যুগে-যুগে বিজ্ঞানের ধ্যানধারণায় প্রকৃতির রহস্য-উদ্ঘাটনে সচেষ্ট। রহস্য উদ্ঘাটন হলেও বিস্ময় সবসময় কাটে না। যেমন আজও বিস্ময় কাটেনি আমাদের, যদিও একশো বছর আগে লুরে ক্যাভার্ন আবিষ্কৃত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া রাজ্যে। এখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রকৃতি নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল। বাইরে থেকে কারো জানার উপায় ছিল না গুহার ভিতরে কী আছে! কারো বুঝবার উপায় ছিল না কী এক অপরূপ নির্বাক পাতালপুরীর সৃষ্টি চলেছিল যুগ যুগ ধরে একান্তে নিভৃতে।

লুরে ক্যাভার্ন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন থেকে মাত্র নব্বুই মাইল দূরে সেনানডোহা পাহাড়ের মনোরম উপত্যকায় অবস্থিত। দুজন ভূতত্ত্ববিদ্ কিছু ভূতাত্ত্বিক নিদর্শনের বাসনায় এখানে একটি গুহার অবস্থিতির কথা অনুমান করেছিলেন। তাঁরা হলেন অ্যান্ড্রু কেম্বেল ও বার্টন স্ট্রীবিন্স। তাঁদের মনে হয়েছিল, বেশ বড় রকমের একরাশ বায়ু বোধহয় শীতল হয়ে গুহায় আটক পড়ে আছে। এই বিশ্বাসে একটি ছোট মুখ খনন করে কেম্বেল সাহেবকে কোমরে দড়ি বেঁধে গুহায় নামিয়ে দেওয়া হল। তিনি নামছেন তো নামছেনই; শেষটায় তাঁর তল মিলল অর্থাৎ মাটিতে পা ঠেকল। মৃদু মোমের আলোয় ভিতরের দৃশ্য দেখে কেম্বেল অবাক



শুভেচ্ছা-কূপ

স্টেলাকপাইপ অর্গান





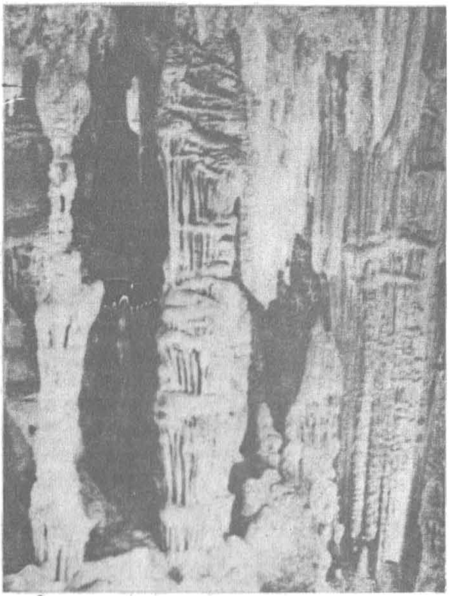
ত্বক সুন্দর নির্মল, নববধূ সম উজ্জ্বল!
ক্লিয়ারাসিল ব্রণর মুখ খোলে,
পরিষ্কার করে আর ছড়িয়ে পড়া রোধ করে।
ব্রণ বেরোলে অনেকেই তো অনেক রকম উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু কাজের উপদেশের জন্যে শুনুন পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কিশোর কিশোরীরা ক্লিয়ারাসিলের উপকারীতা সম্বন্ধে কি বলেন। ক্লিয়ারাসিল...নিরাপদ আর সুবিধেজনক ওষুধ– যার বিশেষত্বই হ'ল আপনার ব্রণর সমস্যার সমাধান করা।
এখন ক্লিয়ারাসিলের সাহায্যে কতখানি ব্রণ পরিষ্কার আর রোধ করবেন তা আপনার ওপর নির্ভর করছে।
কি ক'রে দেখুনঃ
* প্রতিদিন সকালে আর সন্ধ্যেয় ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করুন।
* ক্লিয়ারাসিল সারা মুখে লাগান। ব্রণর জায়গায় একটু বেশী পরিমাণে লাগান।
* ব্রণ পরিষ্কার হয়ে গেলেও ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করতে থাকুন কারণ ক্লিয়ারাসিল অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ রোধ করে।
অদ্বিতীয় ৩-ভাবে ক্রিয়া
শুধু ক্লিয়ারাসিলই তিনভাবে কাজ করে।
১। ব্রণর মুখ খুলে দেয়—ক্লিয়ারাসিলের বিশেষ ফরমূলেশন ব্রণর মুখ খুলতে সাহায্য করে।
২। ব্রণ পরিষ্কার ক'রে দেয়—ব্রণর ময়লা বার ক'রে দিতে সাহায্য ক'রে, ফলে ক্ষতিকর-ভাবে টিপে বার করতে হয় না।
৩। ব্রণ শুকিয়ে দেয়—অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।
Clearasil
SKIN COLOURED MEDICATION
Greaseless Medication for Acne Pimples and Blemishes
মুখখানিতে ফুটে উঠলে স্নিগ্ধ লাবণ্য,
জীবনের প্রতিপল মনে হবে ধন্য!
বিশ্বের "১" নম্বর ব্রণর ক্রীম
OBM 2115 BN

হয়ে গেলেন। এ কী আশ্চর্যের বস্তু সব ভিতরে! মনে হতে লাগল : এ-যে এক রূপশালা, বর্ণাঢ্য স্থাপত্য-ভাস্কর্য-ললিতকলা নিয়ে যেন সত্যি রূপকথার পাতালপুরী! কে বা কারা এর শিল্পী? এ কি কোনো প্রাচীন যুগের হারিয়ে-যাওয়া রাজপ্রাসাদের কোনো অংশ?

সে-দিনটি ছিল ১৩ অগস্ট ১৮৭৮। খনন চলল ধীরে ধীরে। ক্রমশ চোখের সামনে এল চুনাপাথরময় এই অত্যাশ্চর্য গুহার অভ্যন্তর। হাজার হাজার বছর আগে কোনো জলধারা (প্রস্রবণও হতে পারে) এখানকার পাথরের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ গা ছুঁয়ে বয়ে গিয়েছিল। সেই জলধারা-বাহিত পদার্থ পাথরের গায়ে গায়ে লেগে নানান আকৃতি খোদাই করে দিয়েছে। পাথরের কাদামাটি যেটুকু ছিল তা-ও জলধারায় পরিস্রুত হয়ে পাথরকে বিচিত্র আকৃতিতে আত্মপ্রকাশে সাহায্য করল। কালক্রমে জলধারা অন্য খাতে চলে গেল বটে, কিন্তু গুহার চন্দ্রাতপ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা অঙ্গারাম্লযুক্ত চুনাজল (carbonate of lime) পড়তে থাকল। এইভাবে গুহার নীচ থেকে সেই জলকণা জমে জমে নানা ধরনের আকৃতি নিতে থাকল। কোনোটা গাছপালার মতো দেখতে, আবার কোনোটা বহুতল বাড়ি বা স্কাইস্ক্র্যাপারের মতো। বিজ্ঞানের ভাষায় এরা হল স্টেলাকমাইট। আর যেগুলো চন্দ্রাতপ থেকে লম্বিত হয়ে রইল, অর্থাৎ অঙ্গারাম্লযুক্ত চুনাজলকণা চন্দ্রাতপেই লম্বিত হয়ে জমতে থাকল, ওগুলোকে বিজ্ঞান চিহ্নিত করল স্টেলাকটাইট বলে। এসব স্টেলাকটাইট বহু বিচিত্র আকার নিয়ে সেখানে বিদ্যমান। কোনোটা তাঁবু, কোনোটা যেন স্তম্ভ এবং আরো কত কী!

গুহার সবচেয়ে নিচু জায়গা প্রায় একশো ষাট ফুট গভীর। দৃশ্যগুলো সবই একই স্তরে নয়, বিভিন্ন স্তরে। মোট আয়তন কয়েক হাজার বর্গফুট। দর্শনীয় প্রায় সব অংশেরই নাম রয়েছে, যেমন রাক্ষুসে অঙ্গন বা জায়ান্ট'স হল, গির্জা, ছেরাছেনদের তাঁবু (Saracen's Tent), ডায়ানার স্নানাগার, শুভেচ্ছা কূপ, নৃত্যাঙ্গন (Ball room), ইত্যাদি। আকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নামগুলো অবশ্য সবই মানুষের দেওয়া।

প্রকৃতির এই নীরব শিল্প বছরে পাঁচ-ছয় লক্ষ দর্শককে মুগ্ধ করে। মুগ্ধ হওয়ারই কথা। স্বভাবত প্রশ্ন জাগে : মানবহস্তের কারিগরি কিংবা চিত্রাঙ্কন ছাড়া কী করে এত-সব মনোমুগ্ধকর সৃষ্টি চুনাপাথরকে অবলম্বন করে গড়ে উঠল? ওখানে শুভেচ্ছা কূপ বা উইশিং ওয়েল বলে ছোট জলাশয়টিতে বছরে লক্ষ-লক্ষ মুদ্রা পড়ে ধর্মবিশ্বাসী দর্শকের কাছ থেকে, তাঁদের কোনো মনোবাঞ্ছাপূরণের জন্য। ভক্তি-বিশ্বাসের এমন নজির শুধু ভারতে কেন, অন্যত্রও রয়েছে দেখা যায়।

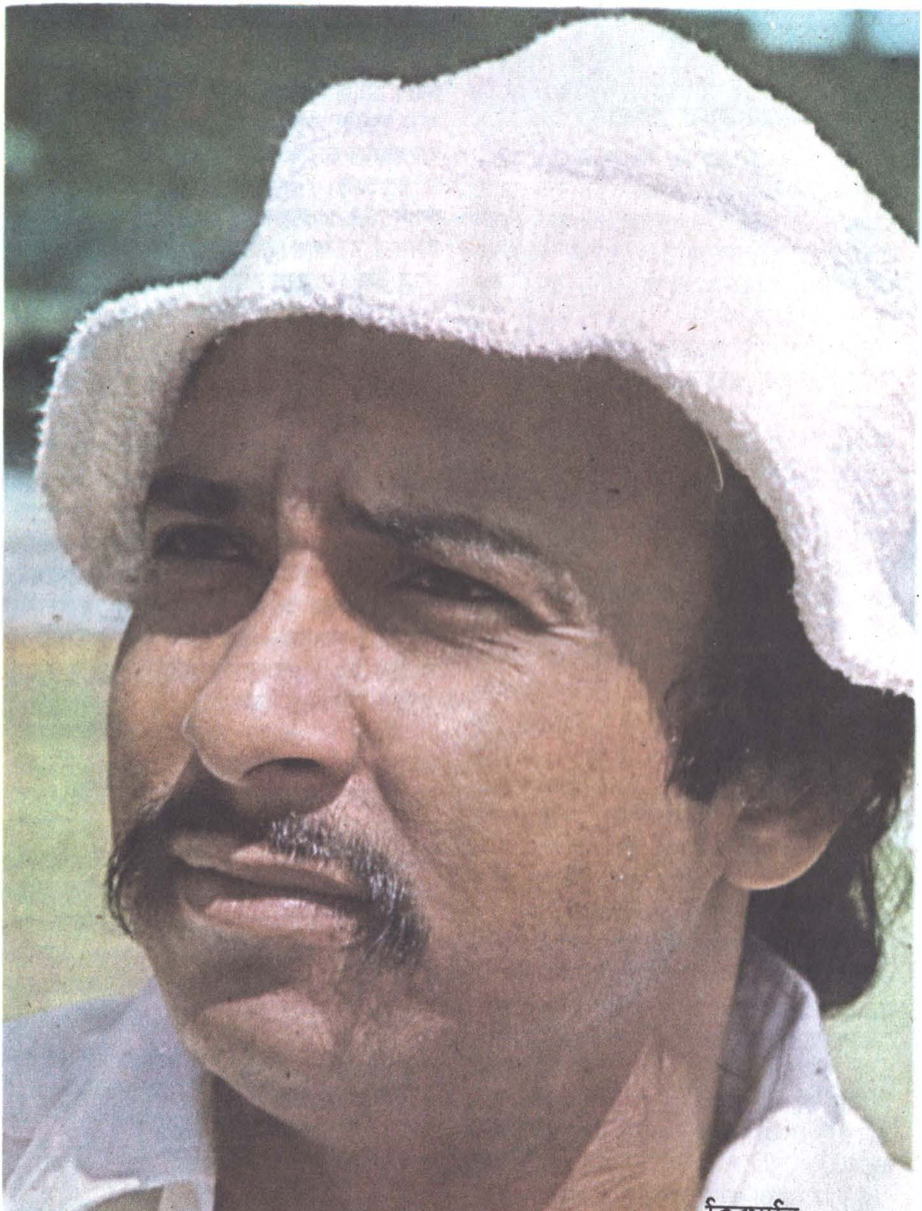


প্রাকৃতিক স্তম্ভ

প্রকৃতি যে শুধু নীরব শিল্পী নন, অর্থাৎ যথাসময়ে সরবও হতে পারেন তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় লুরে ক্যাভার্নে। লেলাণ্ড স্প্রিন্‌কল নামে একজন সঙ্গীতজ্ঞ-বৈজ্ঞানিকের মনে হল যে, এসব ঝুলে-থাকা বিভিন্ন ধরনের স্টেলাকটাইটগুলোকে কোনো-কিছু দিয়ে মৃদু আঘাত করতে পারলে জলতরঙ্গের মতো সুরেলা শব্দ বেরোবে। সেই থেকে তিনি গবেষণা করতে লাগলেন। প্রায় তিন বছর গবেষণার পর তিনি ১৯৫৭ সনে আবিষ্কার করলেন তাঁর বিখ্যাত স্টেলাকপাইপ অর্গান। সেই অর্গানের সুরের মূর্ছনা প্রতিদিন শত শত দর্শক-শ্রোতাকে অভিভূত করে। প্রকৃতির অবদানের সঙ্গে বিজ্ঞানের এই সহবত লুরে ক্যাভার্নের অন্যতম আকর্ষণ।



(আগামী সংখ্যা থেকে নতুন অ্যাডভেঞ্চার)



কিরমানি
ফোটো দেবীপ্রসাদ সিংহ

(পাতা ওলটালেই কিরমানির খবর)

কিরি

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

ভারতীয় ক্রিকেটের কর্মকর্তারা প্রায়ই এমন এক-একটা কান্ড করে বসেন যার কারণ খুঁজলে কোনও কূল-কিনারা পাওয়া যাবে না। অথচ এই সব অদ্ভুত কান্ড-কারখানার সমালোচনা বড়-জোর দু'চার দিন হয়। তার পর সব থিতিয়ে যায়।

ঠিক এমনটি হয়েছিল 'কিরি'-র ক্ষেত্রে। 'কিরি' বলতে ভারতের এক নম্বর উইকেট-রক্ষক সৈয়দ মুজতবা হুসেন কিরমানি। কিন্তু 'কিরি' নামেই ও'কে ভারতীয় দলের সবাই ডেকে থাকেন। গত বছর যখন ইংল্যান্ড সফরের জন্য ভারতীয় দলের নাম ঘোষণা করা হ'ল, তখন সবাই বিস্ময়ে হতবাক। দলে দু-দু'জন উইকেটরক্ষক যাচ্ছেন—ভরত রেড্ডি ও সুরিন্দার খান্না, অথচ কিরমানি বাদ! ঐ দুজন উইকেটরক্ষকই একেবারে আনকোরা, তাঁদের কারোই কোনওরকম টেস্ট-অভিজ্ঞতা ছিল না। অথচ ভারতের নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্য উইকেটরক্ষক কিরমানি, যিনি সে-পর্যন্ত ২৯টি টেস্টে ৯৬৬ রান করে-ছিলেন ও ৬৬ জনকে আউট করেছিলেন, তাঁকে যোগ্য মনে করা হ'ল না।

যা-ই হোক, ভারতীয় দল ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পরই প্রথমে অস্ট্রেলিয়া ও তার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে ছ'টি করে বারোটি খেলা হয়, তার প্রত্যেকটিতেই কিরমানিকে খেলানো হল। একদা যাঁকে বিদায় দেওয়া হয়েছিল, তাঁকে ফিরিয়ে নিতে হল। এবং কিরমানিও প্রাণপণ খেলে দেখিয়ে দিলেন যে, ভারতে তাঁর জায়গা দখল করার মতো উইকেটকীপার অন্তত এখনও তৈরি হয়নি।

গাভাসকার আর আসিফ ইকবাল বলেন, কিরমানি এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উইকেটকীপার। অবশ্য এই বক্তব্যের সঙ্গে হয়তো সকলে একমত হতে পারবেন না। কারণ অ্যালান নট ইংল্যান্ড দলের বাইরে থাকলেও অস্ট্রেলিয়ার রডনি মার্শ, পাকিস্তানের ওয়াসিম বারি ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডেরিক মারে এখনও খেলছেন। এবং বেশ ভালই খেলছেন। তা-ছাড়া ভাল উইকেটকীপারের একটা বাড়তি গুণ হল, রানের দিক দিয়ে দলকে সাহায্য করা। সোজা কথায়, ভাল ব্যাট করা। গত তিন দশকে গডফ্রে ইভান্স, ওয়ালি গ্রাউট, আলেকজান্ডার, অ্যালান নট এটা ভালভাবে দেখিয়েছেন। সেদিক দিয়ে কিরমানিকে কৃতী ঐ প্রাক্তনদের কিংবা বিশ্বশ্রেষ্ঠত্বের অন্যান্য বর্তমান দাবিদারদের সমকক্ষ হিসেবে মেনে নিতে সকলে রাজি না-ও হতে পারেন।

অবশ্য এ-কথা ঠিক, উইকেটকীপিংয়ে কিরমানির দক্ষতা এখন মধ্য-গগনে। সম্প্রতি চমৎকার ফর্মে আছেন তিনি। অবিশ্বাস্য রকমের ক্যাচ নিচ্ছেন। ডানদিকে, বাঁদিকে—যখন যেদিকে দরকার ঝাঁপিয়ে অনেকটা অ্যালান নটের মতোই শারীরিক পটুতার নিদর্শন রাখছেন। বোম্বাইতে ভারতের বিরুদ্ধে সুবর্ণজয়ন্তী টেস্ট খেলতে এসে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ব্রিয়ারলি লিখেছেন, "আগের বছর আমরা যখন এখানে খেলেছি, তখনই কিরমানি এত ভাল উইকেটকীপিং করেছে যে, ওর আর অ্যালান নটের মধ্যে ফারাক সামান্যই ছিল।"

কিরমানি এখন কর্ণাটকের খেলোয়াড় হলেও তাঁর জন্ম মাদ্রাজে—১৯৪৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর। ১৯৬৭ সালে ভারতীয় স্কুল ছাত্রদের যে দলটি ইংল্যান্ড সফর করেছিল, তাতে কিরমানি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। ওটাই তাঁর প্রথম বিদেশ-যাত্রা। পরে তিনি ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান সফর করেছেন। ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারি অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম টেস্ট খেলেন।

জয়ন্তী টেস্ট পর্যন্ত কিরমানি ৪২টি টেস্ট খেলে ১০০ জনকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিয়েছেন—এর মধ্যে ৭৭ জন কট ও ২৩ জন স্টাম্পড। আর রান করেছেন ১,৪৩৯ (গড় ২৭.৬৭)। তাঁর সর্বোচ্চ রান ১০১ নট আউট—কিম হিউজের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বাঙ্গালোর টেস্টে। বাঙ্গালোরেই কিরমানি এখন বসবাস করেন। ওখানকার স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরি করেন।

কিরমানির শততম শিকারটি হলেন ইংল্যান্ডের জিওফ বয়কট—জয়ন্তী টেস্টের প্রথম ইনিংসে বিনির বলে কিরমানির হাতে।

বথামের টেস্ট

আলোক দাশগুপ্ত

ক্রিকেট দলের খেলা। কিন্তু মাঝে-মাঝে এক-একজন খেলোয়াড় অন্য সকলের ভূমিকাকে ম্লান করে দেন। এবারের জুবিলি টেস্টকে নিঃসন্দেহে বথামের টেস্ট বলে চিহ্নিত করা চলে। কাগজে-কলমে ইংল্যান্ড দশ উইকেটে ম্যাচ জিতলেও ভারতীয় ক্রিকেট দল কিন্তু হেরে গেছে বথামের একক কৃতিত্বের কাছে।

অধিনায়ক বিশ্বনাথ টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মাত্র একটি উইকেট হারিয়ে ভারতের রান-সংখ্যা যখন নব্বই পেরিয়ে গেছে, তখন অনেকেই বলাবলি করছিলেন যে, ভারত বড় রানের ইনিংস গড়তে চলেছে। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজের বিরতির ঠিক পরেই বথামের সংহারমূর্তি দেখা গেল।

বথামের বলের গতি মারাত্মক নয়। কিন্তু বলকে দুই দিকেই সুইং করাতে পারেন এবং সুইংয়ের ওপর রয়েছে তাঁর নিয়ন্ত্রণ। বথামের যে বলগুলি উইকেটে আছাড় খেয়ে ছিটকে ভিতরে ঢোকে, সেগুলি ভয়ংকর।

ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়ামের উইকেটে যথেষ্ট ঘাস ছিল এবং উইকেটে পড়ে বলও বেশ লাফাচ্ছিল। অফ-স্টাম্পের বাইরের বলগুলির প্রতি ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দুর্বলতার কথা সমারসেটের অল-রাউন্ডার জানতেন। নিখুঁত নিশানা রেখে বুদ্ধি খাটিয়ে অফ-স্টাম্প আক্রমণ করে গেলেন তিনি। বাকি কাজটা ভারতীয় ব্যাটসম্যানরাই সারলেন। নব্বই রানে এক উইকেট থেকে মাত্র তিন ঘন্টায় ভারতের রান গিয়ে দাঁড়াল ১৯৭ রানে আট উইকেট—বথামের সংগ্রহে গাভাসকার, বিশ্বনাথ, পাতিল, কপিলদেব এবং যশপালের উইকেট। ভারত যে শেষ পর্যন্ত ২৪২ রানের ইনিংস গড়তে পেরেছে তার অনেকখানি কৃতিত্ব টেল-এন্ডারদের (বিশেষ করে কিরমানির) প্রাপ্য। গাভাসকার, বেঙ্গসরকার এবং পাতিল কিছু রান করেছেন। কিন্তু বড় ইনিংস গড়ার জন্যে নিজেদের মোটামুটি গুছিয়ে নেওয়ার পরে কিছুটা অবিবেচকের মতো ব্যাট চালিয়ে ও'রা আউট হয়ে যান।



ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

ইংল্যাণ্ডের ব্যাটিংয়ের স‍ূচনাও মোটেই ভাল হয়নি। মাত্র ৫৮ রানে গ‍ুচ, লারকিনস, বয়কট, ব্রিয়ারলি এবং গাওয়ার প্যাভিলিয়নে ফিরে যাওয়ার পরে পরিত্রাতার ভূমিকায় দেখা গেল বথামকে। তাঁর ডিফেন্স জমাট, মারের বল বেছে নিয়ে খেললেন। টেলরকে সঙ্গে নিয়ে এবং কিছ‍ু চোস্ত মার দেখিয়ে ইংল্যান্ডকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন বথাম। ও'র ব্যক্তিগত সংগ্রহে এল ১১৪ এবং একটি অনবদ্য রেকর্ড। তিনবার একই টেস্টে এক ইনিংসে পাঁচটি উইকেট এবং শতরান আর কোনো ক্রিকেটার পাননি।

উইকেট পেয়ে বথাম যেন আরও ভাল বল করতে লাগলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁকে দেখা গেল র‍ুদ্র ম‍ূর্তিতে। মাত্র ৪৮ রানে সাত উইকেট এবং সমগ্র ম্যাচে ১০৬ রানে ১৩টি উইকেট দখলের অসাধারণ নজির দেখালেন তিনি। জন লিভার (৪৬ রানে সাত উইকেট, দিল্লি টেস্ট, ১৯৭৬-৭৭) এবং হেডলি ভেরিটি (৪৯ রানে সাত উইকেট, মাদ্রাজ টেস্ট, ১৯৩৩-৩৪) ছাড়া আর কোনো ইংরেজ ভারতের বির‍ুদ্ধে এক ইনিংসে এত ভাল বল করেননি।

বথাম এই টেস্টে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়েছেন জন লিভার এবং বব টেলরের কাছ থেকে। লিভার প্রথম ইনিংসে একটি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে তিনটি উইকেট পেয়েছেন। ভাগ্য সহায় হলে আরও বেশি উইকেট পেতেন। টেলর প্রথম ইনিংসে সাতটি ক্যাচ নিয়ে নিউজিল্যান্ডের বির‍ুদ্ধে গড়া পাকিস্তানের ওয়াসিম বারির রেকর্ড স্পর্শ করেছেন।

ভারতীয়দের মধ্যে ভাল বল করেছেন ঘাউড়ি এবং কপিলদেব। দ্বিতীয় ইনিংসে কপিল ভাল ব্যাটও করেছেন, কিন্তু ও'র দ‍ুর্ভাগ্য সঙ্গীর অভাবে বেশি রান করতে পারলেন না।

জ‍ুবিলি টেস্টে ভারতীয় দল-নির্বাচন অনেককেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। অদ্ভুত লেগেছে চেতন চৌহানের বাদ পড়া। চৌহান গত ২৯টি টেস্টে গাভাসকারকে ওপেনার হিসেবে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে গেছেন। নিজে খ‍ুব বড় রানের ইনিংস গড়তে পারেননি, কিন্তু দলের বিপদে শক্ত হাতে লাগাম ধরেছেন। তাঁর জায়গায় ওপেনার হিসেবে খেলানো হয়েছে রজার বিনিকে। সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর থাকলে এর পিছনে হয়তো য‍ুক্তি খ‍ুঁজে পাওয়া যেত। বিনি ভারতীয় দলে একজন অপরিহার্য খেলোয়াড়। তবে তাঁর প্রয়োজন তৃতীয় সিমার এবং মিডল-অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে, ওপেনার নয়। উইকেটে যথেষ্ট ঘাস আছে—এ-কথা বিবেচনা করে শিবলাল যাদবের জায়গায় চেতন চৌহান দলে থাকলে হয়তো ভাল হত।

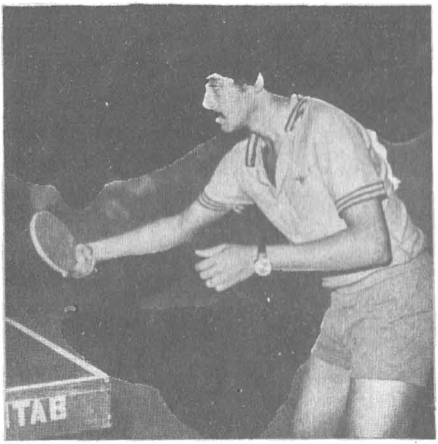
অধিনায়ক হিসেবে বিশ্বনাথের বদলে গাভাসকারকে মানাত ভাল। বিশ্বনাথকে ছোট করতে চাই না, কিন্তু তিনি এমন একজন ক্রিকেটার যিনি নিজের মেজাজে খেলতে ভালবাসেন। বেশ কয়েকটি টেস্টে উনি ভাল ফর্মে নেই। অধিনায়কের গ‍ুর‍ুদায়িত্ব হয়তো ও'র ওপর বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে অধিনায়ক হিসেবে গাভাসকারের রেকর্ড বেশ ভাল—১২টি টেস্টের একটি ম্যাচও তিনি হারেননি। তাঁর অধিনায়কত্বে ভারতীয় দলের মনোবল বেড়েছে এবং দলটিও বেশ শক্তিশালী হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাবেন না বলে গাভাসকার অধিনায়কের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর বাতিল হওয়ার পরে আমি যতদ‍ূর জানি, গাভাসকার অধিনায়কত্ব ফিরে পেতে চেয়েছিলেন।

তবে জ‍ুবিলি টেস্টে বিশ্বনাথ খেলোয়াড়স‍ুলভ মনোভাবের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। আম্পায়ার হন‍ুমন্ত রাও, বব টেলরকে কট বিহাইন্ড আউট ঘোষণা করলে অধিনায়ক বিশ্বনাথ আম্পায়ারকে বলেন যে, উনি আউটের আবেদন প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। কারণ, ও'র মতে বল টেলরের ব্যাট স্পর্শ করেনি। হন‍ুমন্ত রাও তাঁর সিদ্ধান্ত বদল করলেন। নিঃসন্দেহে একটি মধ‍ুর দৃষ্টান্ত যা আজকের ক্রিকেটে সচরাচর দেখা যায় না।

টেবিল টেনিসে জাতীয় খেতাব

মণীশ মৌলিক

তামিলনাড়ুর তেইশ বছরের ছেলে ভি চন্দ্রশেখর এবার টেবিল টেনিসে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। গতবার উদয়পুরে ৪০তম জাতীয় আসরে এই চন্দ্রশেখর দিল্লির মনজিৎ দুয়ার কাছে হেরে গিয়ে রানার্স-আপ হয়েছিলেন। কিছুদিন আগে দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত ৪১তম জাতীয় আসরের পুরুষ বিভাগে 'চ্যাম্পিয়ন' আখ্যা অর্জন করে বেণুগোপাল চন্দ্রশেখর ওঁর অনেক দিনের সাধ পূরণ করতে পারলেন। ফাইনালে মনজিৎ দুয়া এবার কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন উত্তরপ্রদেশের এক দারুণ খেলোয়াড়। নাম, সঞ্জয় কাঠুরিয়া। তাঁরও বয়স খুব অল্প।



ভি চন্দ্রশেখর

সুন্দর স্পিন সার্ভিস করতে পারেন সঞ্জয়। শুধু তাই নয়, রক্ষণাত্মক খেলাতেও বেশ ভাল। কিন্তু প্রতিপক্ষের সমস্ত কৌশল ফাইনাল খেলায় চন্দ্রশেখর তাঁর অভিজ্ঞতার জোরে বানচাল করে দিয়েছিলেন।

প্রথম গেমের গোড়ার দিকে সঞ্জয় বেশ ভাল খেলছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে চন্দ্রশেখর তাঁকে আর দাঁড়াতেই দেননি। সঞ্জয়কে ২১—১৫ পয়েন্টে হারিয়ে চন্দ্রশেখর প্রথম গেম পান। দ্বিতীয় গেমে সঞ্জয় বেশ শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন চমৎকার টপস্পিনের সাহায্যে। শেষ অবধি অভিজ্ঞ চন্দ্রশেখরই ২১—১৮ পয়েন্টে গেম পান। পরপর দুটো গেম হেরে সঞ্জয়ের মানসিক দৃঢ়তা ভেঙে পড়ে। আর সেই দুর্বলতার সুযোগে চন্দ্রশেখর ২১—১৫ পয়েন্টে তৃতীয় গেম জিতে নেন। অতএব, পরপর তিনটি গেম নিয়ে স্ট্রেট সেটে ম্যাচ জিতে চন্দ্রশেখর এবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন।

অনেকেই ভেবেছিলেন, মহিলা বিভাগে এবার চ্যাম্পিয়ন হবেন মহারাষ্ট্রের শৈলজা সালোখে। প্রতিটি ম্যাচে তিনি চমৎকার খেলেছিলেন। দিল্লির ইন্দু পুরী প্রথম দিকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতো খেলেননি। কিন্তু ধীর-স্থিরভাবে খেলে তিনি একের পর এক ম্যাচ জিতে ফাইনালে ওঠেন। ওদিকে শৈলজাও ফাইনালে উঠেছিলেন।

মুখোমুখি হন দুই পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী। আগাগোড়াই ইন্দু আক্রমণাত্মক ঢঙে ও শৈলজা রক্ষণাত্মক চালে খেলেছেন। তবে সুযোগ পেয়েও শৈলজা কখনও আক্রমণ করেননি। সুতরাং বিপক্ষের অনাক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে টপস্পিন ও প্লেসিংয়ের সাহায্যে ইন্দু নিজের আক্রমণ সাজিয়ে ফেলেন। প্রথম গেম ২১—১৮ পয়েন্টে ইন্দুই পান। দ্বিতীয় গেমেও শৈলজা রক্ষণাত্মকভাবে খেলে ২১—১৮ পয়েন্টে জিতে যান। তৃতীয় গেমেও শৈলজা জেতেন এবং ওই একই পয়েন্টে। চতুর্থ গেমে ইন্দুর শক্ত-শক্ত কয়েকটা মার দর্শনীয়ভাবে শৈলজা ফেরত দেন। ইন্দুর ভুলেই শৈলজা গেম জিতে যান।

ম্যাচের অবস্থা দাঁড়ায় ২—২ ও লড়াইটা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পঞ্চম এবং শেষ ম্যাচে দুজনেই প্রতিটি পয়েন্ট সংগ্রহের জন্য জোর লড়াই করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ২১—১৮ পয়েন্টে শৈলজাকে হারিয়ে ইন্দু পুরী জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন। এই নিয়ে ইন্দু পুরী তিনবার জাতীয় খেতাব পেলেন। এর আগে ১৯৭২ ও ১৯৭৫ সালে ইন্দু জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।

বাংলার মেয়েরাই জিতল

বজ্রসেন

শীতের সকাল। মিষ্টি রোদ। হুগলি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির সবুজ লনে ওরা মানে মোমিনা চট্টোপাধ্যায়, আভা মুখোপাধ্যায়, যোগমায়া কোলে, মীনাক্ষী রায়, কাকলী বিশ্বাস, ঊষা পাল। আরও ছিল। মিনতি তরফদার, শুক্লা আশ, লক্ষ্মী নিয়োগী, রত্না মুখার্জি, নূপুর চৌধুরী ও মিলা চট্টোপাধ্যায়। মোমিনা ক্যাপ্টেন। তাই পরিচয় দিয়ে ওকেই জিজ্ঞাসা করলাম, "ফাইনালে কী হবে?"

আনন্দমেলা থেকে আসছি শুনে ওরা সকলেই খুব খুশি হল। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিতে নিতেই জবাব দিতে শুরু করল। সবাই প্রায় সমস্বরেই বলে উঠল, "জিতব। জিততেই হবে। বাংলার বাইরে পারলাম, আর এখানে পারব না?"

হ্যাঁ, চুঁচুড়া ময়দানে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় জুনিয়ার ভলিবল প্রতিযোগিতার (৭—১০ ফেব্রুয়ারি) শেষ দিন সকালে বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়েছিলাম খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলতে। দুটি ফাইনালই—ছেলেদের ও মেয়েদের— ছিল বিকেলে। সকলেই জানেন, বাংলার মেয়েরা রাজ্যের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। ফাইনালে বিপক্ষ কেরল পরাজিত হয় ১৫-৩, ১৫-৯ ও ১৫-১১ পয়েন্টে। ছ'বার প্রতিযোগিতার মধ্যে ১৯৭৮ সাল ছাড়া বাংলা সববার জিতেছে। ১৯৭৮-এর চ্যাম্পিয়ন পাঞ্জাব।

বাংলার মেয়েরা জিতেছে যোগ্য দল হিসেবেই। আভা ও মোমিনার মতো স্পাইকার থাকলে দল শক্তিশালী হবেই। অন্যান্যরাও দারুণ খেলেছে। বিশেষ করে মীনাক্ষী। লম্বায় কম হলে কী হবে, মীনাক্ষী ঠাণ্ডা মাথায় নির্ভুল সেটিং করে আভা-মোমিনাদের মারাত্মক স্পাইকিংয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, দলগত সংহতি ও পারস্পরিক বোঝাপড়া ওদের মধ্যে যথেষ্ট ছিল। কেরলের মেয়েরাও খারাপ খেলেনি। বিশেষত অধিনায়ক সুজাতা সেবাস্টিয়ান, বীণা চাকো, টেসিয়াম্মা সেবাস্টিয়ান আর টেসি জোসেফ। কিন্তু বাংলার অভিজ্ঞতার কাছে ওরা হার মেনেছে।

যেমন মেনেছে হরিয়ানার ছেলেরা রাজস্থানের কাছে। ফাইনালে প্রথম উঠে পর পর দু বারের বিজয়ী রাজস্থানের বিরুদ্ধে প্রথম গেমটাই ওরা 'নিলে' খেয়ে গেল। তার পর আর কী লড়া যায়? তবুও তো ওরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় গেমে যথাক্রমে ১১ ও ১০

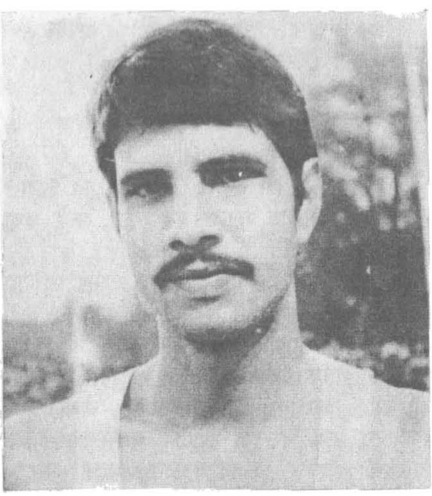


বিজয়িনী বাঙালি মেয়েরা

পয়েণ্ট করেছিল। দ্বিতীয় গেমে ১৩-১১ অবস্থায় গেমটা বহুক্ষণ আটকে ছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি হরিয়ানা। পারেনি কারণ অধিনায়ক দীর্ঘদেহী ওমপ্রকাশ এবং মেহের সিং ছাড়া কৃতী খেলোয়াড় দলে তেমন কেউ ছিল না। কিন্তু রাজস্থানের সকলেই, বিশেষত গোপাল রাম, মহম্মদ কালাম আর অধিনায়ক হাগামি লাল খুবই উঁচু মানের খেলোয়াড়। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আধুনিক ভলিবলের প্রথা-প্রকরণ রাজস্থানের আয়ত্তে। অই হ্যাটট্রিক করতে ওদের অসুবিধা হয়নি। রাজস্থানকে কিছুটা বেগ দিতে পেরেছে একমাত্র বাংলা। অতনু দাশ, অগ্নি মিত্র ও দীপক সাহা সেমি ফাইনালটিকে চার গেমে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। দুর্ভাগ্য, বাংলাকে তৃতীয় স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল।

অভিযোগ, 'অনধিক ১৮' প্রতিযোগিতায় এমন বহু ছেলেমেয়ে খেলেছে যাদের বয়স বেশি। ন্যায়নীতির স্বার্থেই এর তদন্ত হওয়া দরকার। শেষ পর্যন্ত কী হবে জানি না। তবে আপাতত একটা জিনিস অনুভব করলাম—ভলিবলের জনপ্রিয়তা কতখানি! চোখে না দেখলে বোঝা যায় না!

প্রায় দু লাখ টাকার মতো খরচ হয়েছে এবারের জাতীয় জুনিয়র ভলিবলে। অংশ নিয়েছিল ছেলেদের ১৭টি ও মেয়েদের ১৬টি দল। 'লীগ-কাম নক-আউট' প্রথায় প্রতিযোগিতাটি পরিচালিত হয়েছে।



হরিয়ানার ওমপ্রকাশ



বিভিন্ন বিভাগের কৃতী প্রতিযোগীরা

মিষ্টি স্পোর্টস

বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে ক্যাডবেরি স্পোর্টস হয়ে গেল রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়ামে—গত ৩১ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি। ১০৬টি স্কুল থেকে মোট ৯৬৮ জন ছাত্রছাত্রী এই স্পোর্টসে অংশ নিয়েছিল দেখলাম, আড়িয়াদহ শ্রী বিদ্যানিকেতনের জয়জয়কার। ঐ স্কুলের ছেলেরা, মেয়েরা দুদলই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে—যথাক্রমে ৫৪ পয়েন্ট ও ৩৩ পয়েন্ট পেয়ে। শাবাশ! আর এরা বিভিন্ন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে: প্রিসিলা ডন হপলে (সেণ্ট টমাস ডে স্কুল) ও নিমাই কুণ্ডু (প্রান্ত পল্লী হাই) ও সিনিয়ারে, কল্যাণী বণিক (বাসুদেবপুর পল্লী হিতসাধনী গার্লস হাই স্কুল) ও শ্যামল মুখার্জি (নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল) ইণ্টার-মিডিয়েটে চিন্ময়ী দাশগুপ্ত (আড়িয়াদহ শ্রী বিদ্যানিকেতন) ও নাসিম আমেদ (মহঃ জান হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল) জুনিয়ার বিভাগে। সব চেয়ে বেশি পয়েণ্ট পেয়েছে প্রিসিলা। ও আবার জ্যাভেলিন থ্রো এবং লং জাম্পে আগের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে ক্যাডবেরির এই স্পোর্টস নতুন কিছু নয়। প্রতি বছরই হয়—এবারেরটি ছিল সপ্তম। কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই চারটি কেন্দ্রে আলাদাভাবে স্পোর্টস হওয়ার পর প্রত্যেক কেন্দ্রের বিজয়ীরা দিল্লিতে আন্তঃনগরী ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

ভোরবেলাকার রঙ

কুম্ভক

আধুনিক কবিদের যে কেউ পছন্দ করে না, তার একটা যুক্তি আছে। —গম্ভীরভাবে ঘোষণা করল নন্তু।

একটা কেন, অনেক যুক্তি থাকাই সম্ভব। কিন্তু তোর যুক্তিটা কী?

তুমি বলছ, মেলানোটাকে মন দিয়ে বুঝতে হবে, শুধু চোখ দিয়ে নয়, শুধু কান দিয়ে নয়।

কেন, অনেক সময়েই তো চোখ-কান দিয়ে বোঝা যায়। তবে সেটুকুই যথেষ্ট নয়, তা ঠিক।

কিন্তু অনেক সময়ে যে মন দিয়েও থই পাওয়া যায় না। বড্ড উলটোপালটা কথা আধুনিক কবিতায়।

কী-রকম?

এই যেমন, জীবনানন্দ লিখেছেন ভোরের বর্ণনা। উদ্ভট। ভোরের সুন্দর বর্ণনা কি পড়িনি আমরা ভেবেছ?

তা কেন ভাবব? 'রাত পোহাল ফরসা হল, ফুটল কত ফুল' এসব তো নিশ্চয় পড়েছিস।

দেখ টুম্পি, কাকু ঠাট্টা করছে আমাদের।

তবে কি এইটে বলব? 'রবিমামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ওই'? এইরকম?

এসব তো বাচ্চাদের।

তবে কি সুকান্তর কবিতা চাই? 'রানার রানার ভোর তো হয়েছে, আকাশ হয়েছে লাল'?

কেন, রবীন্দ্রনাথের তো আছে কত বর্ণনা, কত সুন্দর।

একটা অন্তত শুনি।

শুনবে একটা? সেদিন পড়লাম, 'ভোরবেলাকার চাঁদের আলো মিলিয়ে আসে শ্বেতকরবীর রঙে।' ভোরের রঙের সঙ্গে করবীর রঙ মিলিয়ে দিয়ে বেশ ভালই হল না ছবিটা?



আমিও একটা গান জানি কাকু। 'আলোর অমল কমলখানি কে ফুটালে।' এখানে পদ্মের মতো হয়ে গেল ভোর।

আমি একটা বলব শুনবি? রাত কেটে ভোর হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। কী-রকম? 'কড়া লিকারে দুধ পড়বার মতো করে রাত ফরসা হল।' কী, দেখতে পাচ্ছিস ছবিটা?

একটু চুপ করে থেকে টুম্পি বলল : পুরো ফরসা হবার একটু আগের কথা, না? বেশ ভাল। কিন্তু এ নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের নয়।

কী করে বুঝলি?

এ যে বড্ড খাওয়া-দাওয়ার কথা!

ঠিকই ধরেছিস। এ হল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা।

একেবারে চায়ের লিকার? ইনি নিশ্চয় চা খেতে খুব ভালবাসেন?

তা তো জানি না, তবে এ লাইনটার ঠিক আগে চা খাবার একটা কথাই ছিল বটে। এইভাবেই তো তৈরি হয় মিল, এক ভাবনা থেকে সহজ আরেক ভাবনায় গড়িয়ে যায় মনটা। মিলে যায় একটার সঙ্গে আরেকটা। কিন্তু নন্তুর সেই উদ্ভট লাইনটা তো শোনাই হল না।

সে আর বোলো না। জীবনানন্দ লিখেছেন, ভোরের বেলা পৃথিবী আলোয় ভরে গিয়েছে। কী-রকম আলো? না, 'কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়'। এ কখনো হয়? সবুজ আলো?

সবুজ আলো কেন হবে না রে দাদা? ভোরের রঙটা যে সবুজ হয় না, সেই কথা বলো।

সেইটেই তো বলছি। এ তো আর রেলের সবুজ বাতি দেখানো নয়। শ্বেতকরবীর রঙে ভোর হচ্ছে, পদ্মের রঙে ভোর হচ্ছে, এটা তো বুঝতে পারি। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আলো এগিয়ে আসছে, এই ছবিটার জন্য কড়া লিকারে দুধ পড়বার রঙটা ভাবতেও রাজি আছি। কিন্তু লেবুপাতার মতো সবুজ আলোর ভোর? চালাকি?

চামেলির লেখা

প্রসাদ

চামেলি খুব মন দিয়ে কী যেন লিখছে। হ্যাঁ, আমরা ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখি কী লিখছে। প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে লিখেছে ঃ

MY CAT

আসলে, বাবা বলেছেন, "মিলি কান্না-কাটি করলেই কি আর আরাবল্লী তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে? তার চেয়ে লেখো না, আরা-বল্লীর কথা? নেহাত যদি ও ফিরে না আসে, তোমার বন্ধুরা তোমার লেখা পড়ে ওর কথা জানতে পারবে। ওর কথা মনে রাখবে। এমনি করেই তো যে চলে যায় তার স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকে।" তাই চামেলি লিখছে ঃ

MY CAT

I had a cat. Her name was Araballi.

এ পর্যন্ত লিখে মিলির মনে হল, "এ আবার কী? আরা কি একেবারেই চলে গেছে নাকি? আর আসবে না? নিশ্চয় আসবে। কোথাও বেড়াতে গেছে, যেই আমার জন্যে মন কেমন করবে, আবার চলে আসবে।"

কেটে দিয়ে সে আবার লিখতে আরম্ভ করল ঃ

I have a cat. Her name is Araballi. She loves fish and milk. She plays with me. I take her to bed with me. She catches mice. She mews when she's hungry and purrs when she's happy. She is a nice cat.

বাবা দেখে বললেন, "লেখাতে কোন ভুল নেই, কিন্তু এ কি তোমার বন্ধুদের পড়তে ভাল লাগবে? এমন ভাবে লিখতে হয় যাতে প্রথম বাক্যটা পড়েই আরো পড়তে ইচ্ছে করে। ধরো, তুমি যদি এইভাবে শুরু করতে ঃ

Some people prefer dogs or goldfish or budgerigars, but my pet is a cat.

তারপর, ধরো তার নামের কথা। কী করে নাম হল আরাবল্লী? যদি লেখ, পড়তে ভাল লাগতে পারে ঃ



I call her Araballi because she turned up at our house just after we had returned from Rajasthan. We'd been there for our Puja holidays. Araballi is the name of a famous mountain in Rajasthan.

এইরকম ভাবে মিলির বাবা বলে গেলেন কী করে সে লেখাটাকে এমন করতে পারে যাতে যে পড়বে তার নেহাত শুকনো, নীরস মনে না হয়।

I have a cat.

এই বাক্যটাতে যদি একটি মাত্র শব্দ জুড়ে দিই সঙ্গে সঙ্গে এর মনোযোগ আকর্ষণ করবার ক্ষমতা বেড়ে যায় ঃ

I have a black cat.

ছবিটা আরও জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে যদি লিখি ঃ

I have a black cat with eyes that shine in the dark.

অবশ্য আরাবল্লী কালো নয়, ধবধবে সাদা। কাজেই চামেলি লিখতে পারত ঃ

I have a cat, white as snow, who always keeps herself very clean.

কী করে পরিষ্কার রাখে সে নিজেকে?

She licks herself all over. She licks away the dirt. When she's doing that Mother would sometimes say, "Look how Araballi's washing herself."

এবারে তোমরা নীচের বাক্যগুলোর বদলে এমন এক-একটি বাক্য লেখো যা আরেকটু ইনটারেস্টিং।

a) She plays with me.
b) She is a nice cat.
c) She catches mice.

ছোটদের যত সেরা বই



লীলা মজুমদার জানেন ছোটদের মনের মতো লেখা কী করে লিখতে হয়। তাঁর 'বাতাসবাড়ি' উপন্যাসটি অন্যান্য লেখার থেকে আলাদা-রকমের। কল্প-বিজ্ঞান কাহিনীর আমেজ-ভরা এই উপন্যাসে তিনি লিখেছেন এক ভয়ঙ্কর দিনের কথা—যেদিন পৃথিবীর লোক বাড়তে বাড়তে এমন হবে যে, একটু থাকবার জায়গা আর নেই, নেই ফসলের ক্ষেত আর বাড়ি তৈরির জমি, নেই মাটির নীচে তেল আর কয়লা, মাটির ওপরের গাছ পর্যন্ত সব কাটা হয়ে গেছে। তখন? তখন যে কীভাবে বাঁচবে মানুষ তারই আভাস তুলে ধরেছেন তিনি 'বাতাসবাড়ি'তে।



'মাধুরীলতার চিঠি' তোমরা অনেকেই পড়েছ। রবীন্দ্রনাথের বড়ো মেয়ে মাধুরীলতা কিন্তু খুব সুন্দর কিছু গল্পও লিখেছিলেন। সেই-সব গল্প এবং মাধুরীলতার অনুবাদ-করা কিছু গল্প নিয়ে 'মাধুরীলতার চিঠি'র মতোই আরেকটি স্মরণীয় বই বেরিয়েছে। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত এই বইটির নাম 'মাধুরীলতার গল্প।' এই বইয়ের ভূমিকায় লীলা মজুমদার লিখেছেন—'কি কাহিনীতে, কি উপস্থাপনায় আশ্চর্য নিপুণতা। একটি বাড়তি কথা বা অনাবশ্যক চরিত্র নেই ; কোথাও কলমের আড়ষ্টতা বা ক্লিষ্টতা নেই।' লিখেছেন, "মানবতার গুণে এগুলি অতুলনীয়। যে পড়বে সে-ই তার আস্বাদ পাবে।"

মৌমাছির রাজার রাজা ৭ **সরলাবালা সরকারের** পিনকুর ডাইরি ৩ **সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের** ছেলেদের বিবেকানন্দ ২ **পাপু (সুব্রত সরকার)র** প্যাপুর বই ৬ পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫ **পার্থসারথি চক্রবর্তীর** কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজব কথা ৪ রসায়নের ভেল্‌কি ৩ ম্যাজিকের মতো মজা ৫ তত সহজ ছিল না ৫ **সুকুমার রায়ের** সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ১ম ২৫ ২য় ৩০ জীবজন্তু ৮ সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০ **বুদ্ধদেব গুহর** ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫ মউলির রাত ৫ **ননীগোপাল চক্রবর্তীর** চরকাবুড়ি ৪ যাদুঘরে চল যাই ৬ **মতি নন্দীর** ননীদা নট আউট ৫ স্ট্রাইকার ৬ স্টপার ১০ কোনি ৭ **বিমল করের** ওআন্ডার মামা ৬ কাপালিকরা এখনও আছে ৭ রাজবাড়ির ছোরা ও হারানো জীপের রহস্য ১০ **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিমল দাসের** সাদা বাঘ ১০ **অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর** শাদা ঘোড়া ৮ **অজেয় রায়ের** ফেরোমন ৬ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬ **গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরীর** নিশীথ রাতের আহ্বান ৩ **গৌরকিশোর ঘোষের** দুষ্টুর দুপুর ৪ **আনন্দ বাগচীর** বনের খাঁচায় ৬ **মনোজ বসুর** ওস্তাদ নটবর ৬ **শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক ৪ **শিশির করের** গঙ্গায় বাঘ ৪ **লীলা মজুমদারের** বাতাসবাড়ি ৫ **অমরনাথ রায়ের** দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী ১০ **আশাপূর্ণা দেবীর** রাজকুমারের পোশাকে ৪ **সমরেশ বসুর** মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৬ **অমিতাভ চৌধুরীর** তেপান্তরের মাঠে ৪ **গিরিধারী কুণ্ডুর** টংসা চু ৫ **বিমল মিত্রের** রাজা হওয়ার ঝকমারি ৮ **শিশিরকুমার মজুমদারের** তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫ **অন্নদাশংকর রায়ের** হৈ রে বাবুই হৈ ৫ **অজিত সেনের** ডাকাবুকো ৫ **রেবন্ত গোস্বামীর** অরুমিতুদের কথা ৪ **সুবোধ ঘোষের** সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৫ **সত্যজিৎ রায়ের** নানা স্বাদের কাহিনী : এক ডজন গপ্‌পো ১২ আরো এক ডজন ১০ ফটিকচাঁদ ৮ **শিবরাম চক্রবর্তীর** হর্ষবর্ধর নিত্যনূতন ৪ শিব্রামের বারো আড়ি ৫ দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৬ **পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের** মাধুরীলতার চিঠি ৫ **নারায়ণ চক্রবর্তীর** হলদে সবুজ ক্রিস্ট্যাল ১০ **সমরজিৎ করের** একটি সংকেতের জন্যে ৬ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** তপন চরিত ৬ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** গোসাঁই-বাগানের ভূত ৮

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

কলোরেডো

প্রসাদ



কলোরেডো নদীর উৎস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম দিকের রকি পর্বত। প্রচুর বরফগলা জলে এই নদী পুষ্ট হয়। গতিপথ ২,৩২০ কিলোমিটার। অববাহিকার আয়তন ৬৩২,০০০ বর্গ কিলোমিটার। সাতটি রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়ে নদীটি বয়ে চলেছে। মেক্সিকো রাষ্ট্রে প্রবেশ করার আগে এই নদী সতেরো মাইল ধরে অ্যারিজোনা রাজ্যের এবং মেক্সিকোর সীমানা নির্ধারণ করেছে, তারপর মেক্সিকো রাষ্ট্রে প্রবেশ করে আরও আশি মাইল বয়ে গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরে মিশেছে। এই নদীই গভীর খাত খনন করার জন্যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত। এই গভীর খাতগুলিকে ক্যানিয়ন বলা হয়। কলোরেডো নদীর 'গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন'কে প্রকৃতির এক বিস্ময়কর সৃষ্টি বলা যেতে পারে। এই নদী উত্তর আমেরিকার একটি শুষ্ক অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। নদীর জলের সাহায্যে নানারকম পরিকল্পনা করে এই অঞ্চলের অনেক উন্নতি করা হয়েছে। সেইজন্যে এই নদীকে দক্ষিণ-পশ্চিমের জীবনরেখাও বলা হয়।

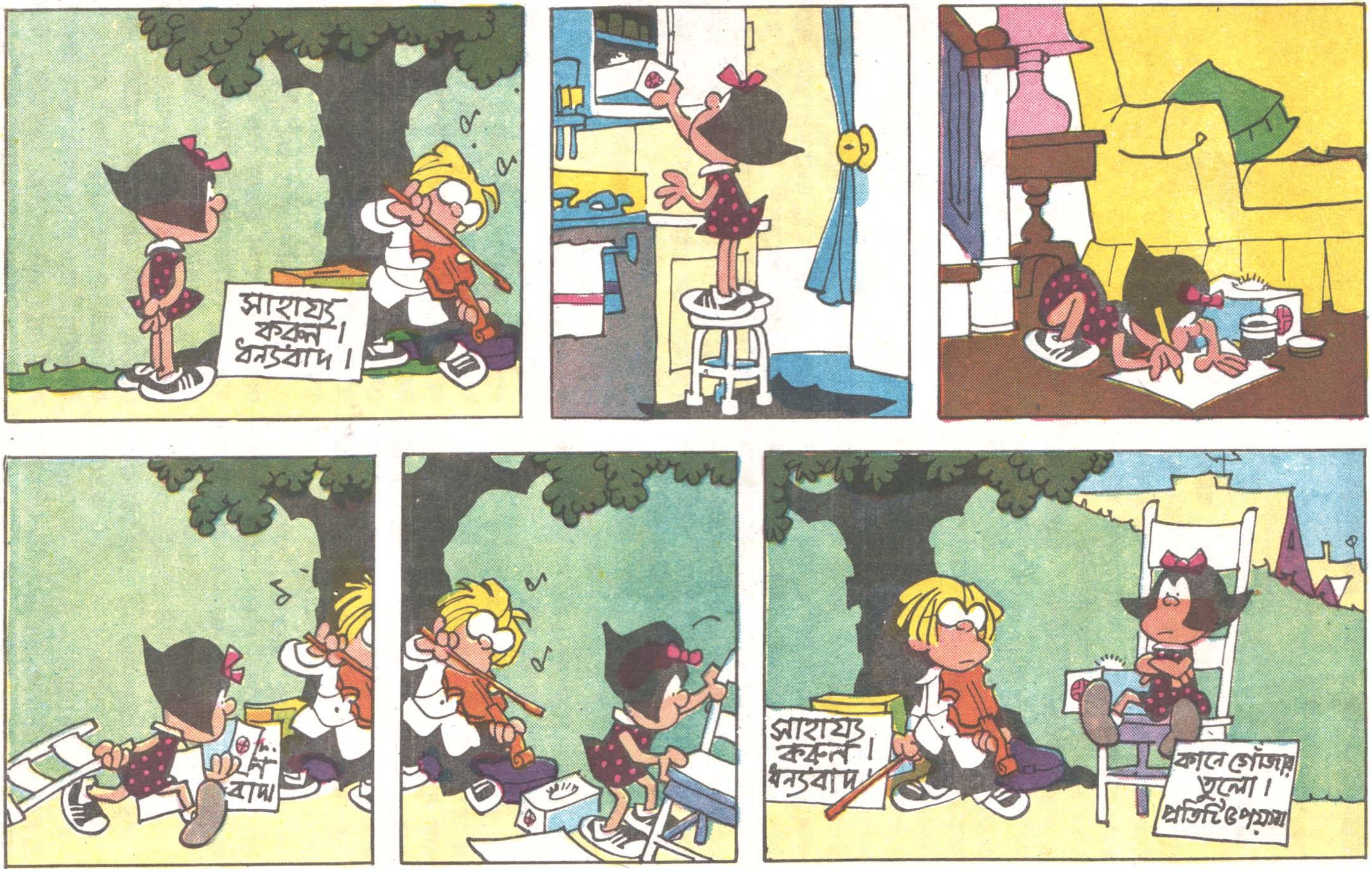
প্রায় এক হাজার মাইলেরও বেশি গতিপথে এই নদী পাহাড়ের মধ্য দিয়ে গভীর খাত সৃষ্টি করে বয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম দিক থেকে এবং পূর্ব দিক থেকে অনেক উপনদী এসে মিশেছে। নদীটি অ্যারিজোনা রাজ্যের উত্তর অংশে যে গভীর খাত কেটেছে সেটিই গ্র্যান্ড্ ক্যানিয়ন নামে বিখ্যাত।

ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের পশ্চিম দিকে কলোরেডো নদীর দক্ষিণ অংশে আছে সালটন্ বেসিন—একটা বড় মরুভূমি। আগে ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগর উত্তর আমেরিকার মধ্যে আরও দূরে পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—কিন্তু পাহাড় থেকে নদীবাহিত মৃত্তিকা এখন একটা বিরাট প্রাকৃতিক বাঁধের সৃষ্টি করেছে। এই বাঁধ কলোরেডো নদীর জলাধারকে দুভাগে ভাগ করছে। নদীর নীচের অংশের জলধারা —একটা গভীর খাত খনন করে উপসাগরে গিয়ে মিশছে। কিন্তু উপরের অংশের জলধারা মরু জলবায়ুর জন্যে বাষ্পে পরিণত হয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৩৫ ফুট নিচু একটা মরুভূমি সৃষ্টি করেছে।

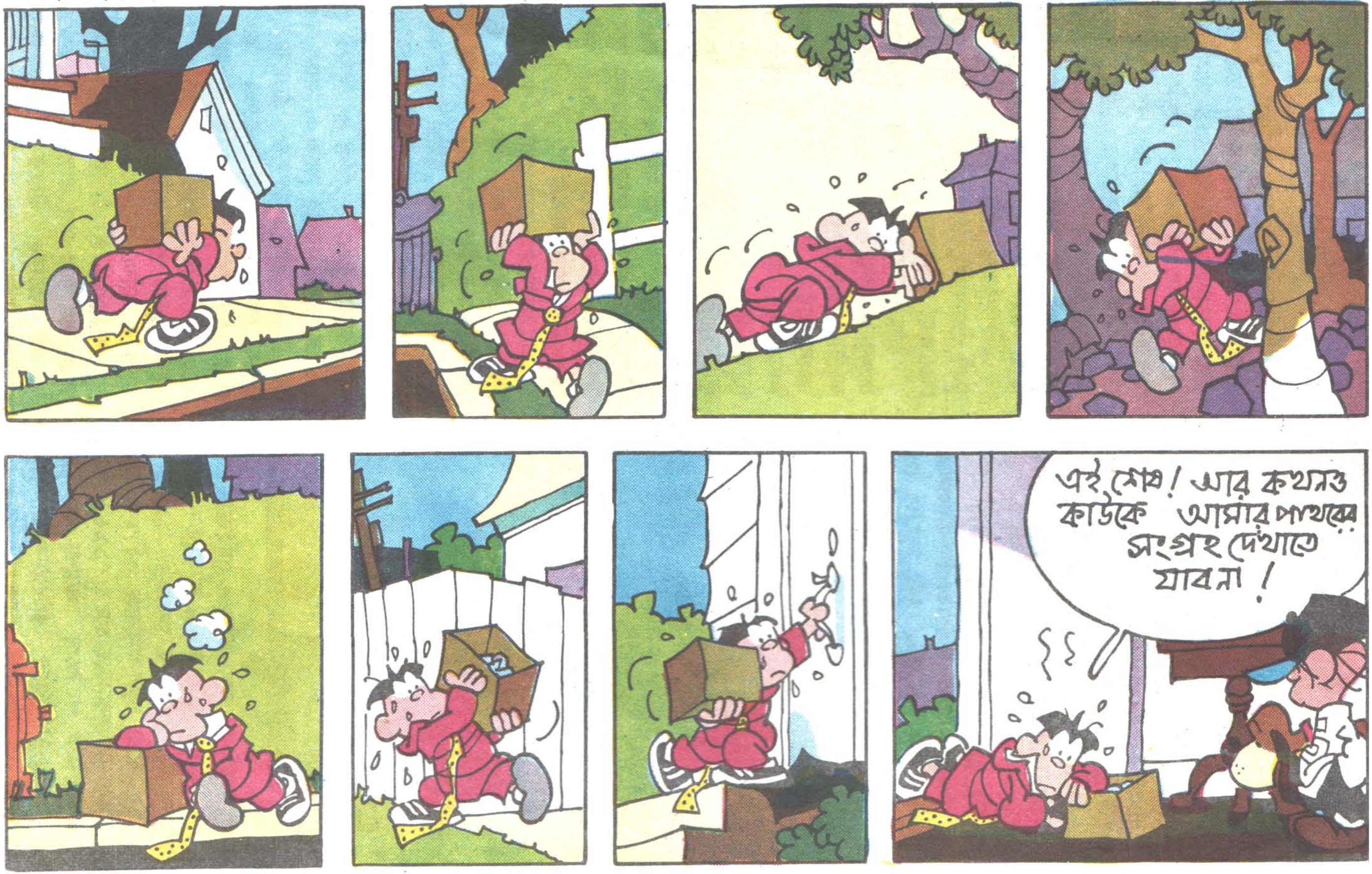
ক্যালিফোর্নিয়া ও মেক্সিকো রাষ্ট্রের সীমানার তিন মাইল নীচে কলোরেডো নদীর জলধারার খানিকটা অংশ সালটন নিম্নভূমিতে প্রবেশ করে 'সালটন সিনক' নামে একটা জলাভূমির সৃষ্টি করেছে। একে বলা হয়, 'সালটন সমুদ্র'। এই জলাভূমি কৃষিবহুল অঞ্চলের ক্ষতি করতে পারে বলে কয়েকটি বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। কলোরেডোই বোধহয় পৃথিবীর প্রথম নদী যাতে বহুমুখী উন্নতির পরিকল্পনার কথা ভাবা হয়। এই পরিকল্পনার মধ্যে আছে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, জলসেচ, নানা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও যাতায়াতের সুব্যবস্থা।

এইসব পরিকল্পনা অনুসারে নদীতে যে-সব বাঁধ বাঁধা হয়েছে তার মধ্যে হুভার বাঁধ পৃথিবীবিখ্যাত্। কলোরেডো নদীর হাভাসু জলাধার থেকে জল নিয়ে লস-এঞ্জেলেস শহরের জলের সমস্যা খানিকটা মেটানো হয়েছে এবং স্যান ডিয়েগো শহরে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। নদী এবং তার উপনদীগুলিতে বাঁধ বেঁধে এবং জলাধার সৃষ্টি করে এই শুষ্ক অঞ্চলের জলের সমস্যা মেটানোর আরও চেষ্টা চলছে।

বাঘা



বাঘা



তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

দেশপ্রিয় পার্কের বিপরীত দিকে রাসবিহারী এভিনিউয়ের ওপর তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনের চারতলা লাল বাড়ি। ১৯৩২ সালে এই স্কুলটি স্থাপিত হয়েছে। আগে এই স্কুলটি ছিল বিপিন পাল রোডের ভাড়া বাড়িতে। তারপর ১৯৩৭ সালে বর্তমান বাড়িতে উঠে আসে। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্র-সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছশো।

১৯৪৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এই স্কুলের ছেলে



প্রথম হয়েছিল। নাম, সীতেশ লাহিড়ী। এখন তিনি বিখ্যাত চিকিৎসক ও নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ। ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল এই স্কুলেরই ছাত্র। ১৯৬৪ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করেছিল। আবার ১৯৬৮ সালে বাণিজ্য-শাখায় প্রথম হয়েছিল এই স্কুলেরই ছেলে।

গত বছর ৩৬ জন ছাত্র এই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। তাদের মধ্যে ১৬ জন প্রথম বিভাগে, ১৯ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং একজন তৃতীয় বিভাগে পাস করেছিল। তিনজন ছাত্র স্টার পেয়েছে। কেউ ফেল করেনি। এই স্কুলের ছাত্ররা সাধারণত মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল করে না। প্রতি বছরই এই স্কুলের কিছু ছাত্র জাতীয় মেধা বৃত্তি পায়।

এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে আছেন চুনী গোস্বামী, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সাগর সেন এবং বুদ্ধদেব গুহ।

শ্রীযুক্ত শিবনাথ দে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ২০ বছরের। প্রধান শিক্ষক হয়েছেন বছর চারেক। শিবনাথবাবুর বিষয় গণিত। কথাপ্রসঙ্গে শিবনাথবাবু জানালেন, "ছোটদের পত্রিকাগুলির মধ্যে পাক্ষিক আনন্দমেলাই অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছে, এ বিষয়ে কোনো তর্কাতর্কি নেই। এই পত্রিকার লেখাগুলির মধ্যে চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, এগুলি ছোটদের বুদ্ধিবৃত্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।"

"কী ধরনের উত্তর লিখলে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়া যায়?"

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধান শিক্ষক জানালেন, "প্রশ্ন যে-রকম ঠিক সেই ধরনের উত্তরই হওয়া উচিত। আসল উত্তরটা খুঁজে নিতে হয়। অনেক সময় ছাত্ররা উত্তর কতটুকু হওয়া উচিত—সঠিক ধারণা করতে পারে না। ফলে, অনেক বেশি লিখে ফেলে। লক্ষ রাখতে হবে, উত্তরটা যেন সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ হয়। উত্তরের ভাষা অবশ্যই সহজ ও সরল হওয়া চাই। বানান-ভুল যথাসম্ভব এড়াতে হবে। উত্তরে যেন বুদ্ধির ছাপ থাকে। সাধারণ ছাত্ররা যদি প্রশ্ন বুঝে সহজ ও সরলভাবে উত্তর দেয় তাহলেই পাস করতে পারবে। ভাল ছাত্ররা মুখস্থ-শক্তি পরিহার করে নিজের চিন্তা ও বুদ্ধি অনুসারে উত্তর দেবে।"

"পাঠক্রমের প্রতিটি বিষয় কী ভাবে পড়লে পরীক্ষার ফল ভাল হবে?"

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধান শিক্ষক জানালেন, "ইংরেজি ও বাংলার পাঠ্য বই যত

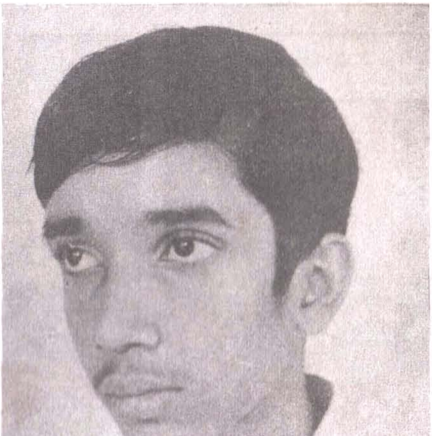
বেশি পড়বে, নম্বর তত বেশি উঠবে। পাঠ্য বই ভাল করে পড়া না থাকলে শুধু মানে বই পড়ে কেউ অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। যত বেশি লেখা যায় পরীক্ষার ফল ততই ভাল হয়। অঙ্ক কষাকে শাস্তি বলে মনে করা চলবে না। অঙ্ক হচ্ছে এমনই একটা বিষয়, যাতে ক্রমাগত অভ্যাস দরকার। অভ্যাস করলে বেশি নম্বর পাবে।

"জ্যামিতির অঙ্কনও অভ্যাস করা দরকার। মুখস্থ করলে চলবে না। 'মেড-ইজি'-মার্কা বই পড়লে কাজ হবে না। সায়াপ্সে হাতে-কলমে কাজ করলে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বাড়বে, মনেও রাখা যাবে। শুধু পড়ার বই মুখস্থ করলে ভাল নম্বর পাওয়া যাবে না। ভূগোলে মানচিত্র না বুঝতে পারলে ভূগোল সম্বন্ধে কোনো ধারণা হবে না। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও মানচিত্র ব্যবহার করা খুবই দরকার। শুধু সিলেবাসের বই পড়লেই হবে না, আরও বেশি জানবার জন্যে বাইরের বইও পড়তে হবে।"

"কর্মশিক্ষা ও শারীর-শিক্ষায় কী ভাবে ভাল নম্বর পাওয়া যেতে পারে?"

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধান শিক্ষক জানালেন, "কর্মশিক্ষায় স্কুলে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেটা ভাল করে নিজের হাতে করলেই ভাল নম্বর পাওয়া যাবে। শারীর-শিক্ষায় প্রত্যহ ব্যায়াম অভ্যাস করা চাই, তাতে জড়তা কেটে যায়।"

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

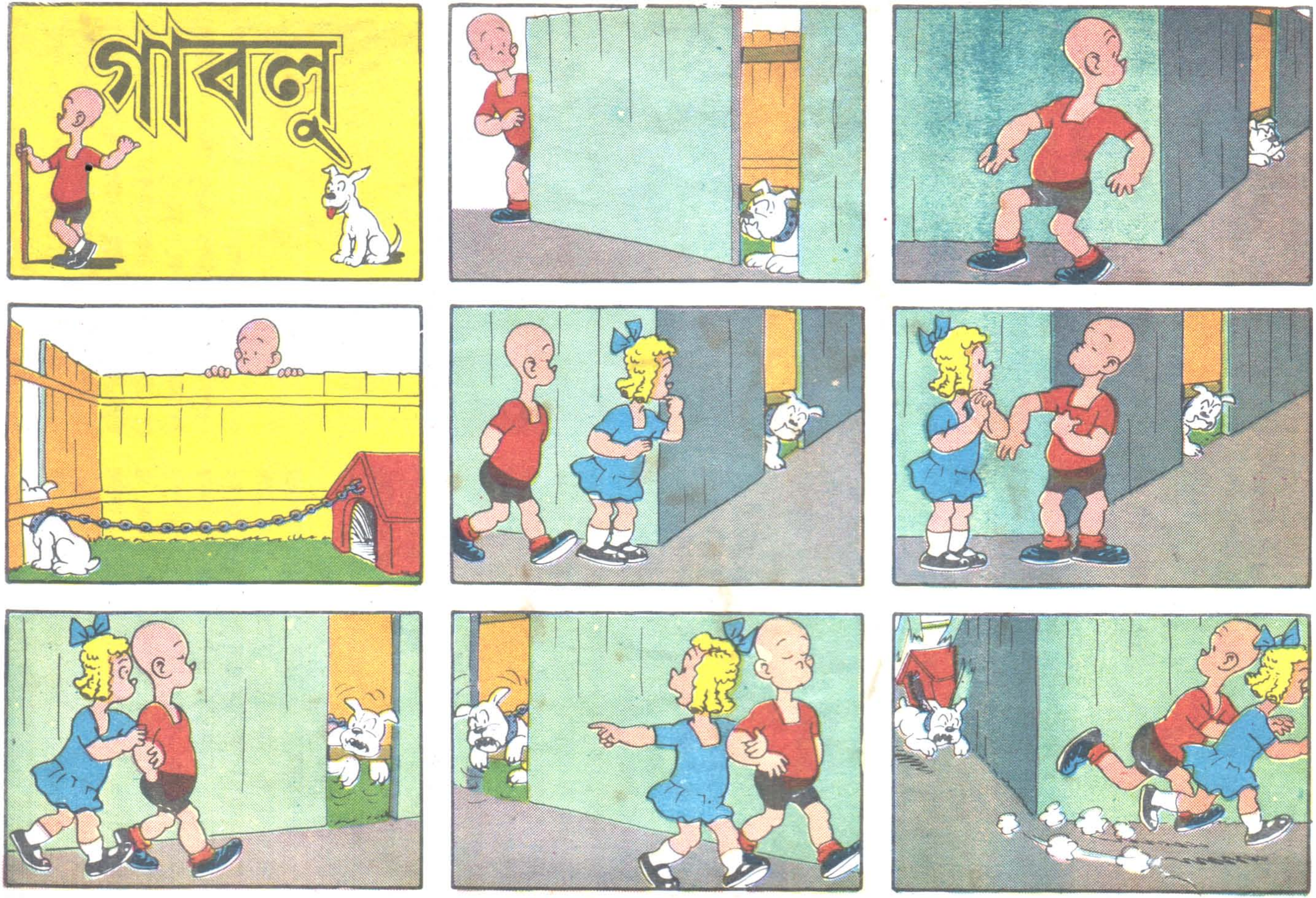


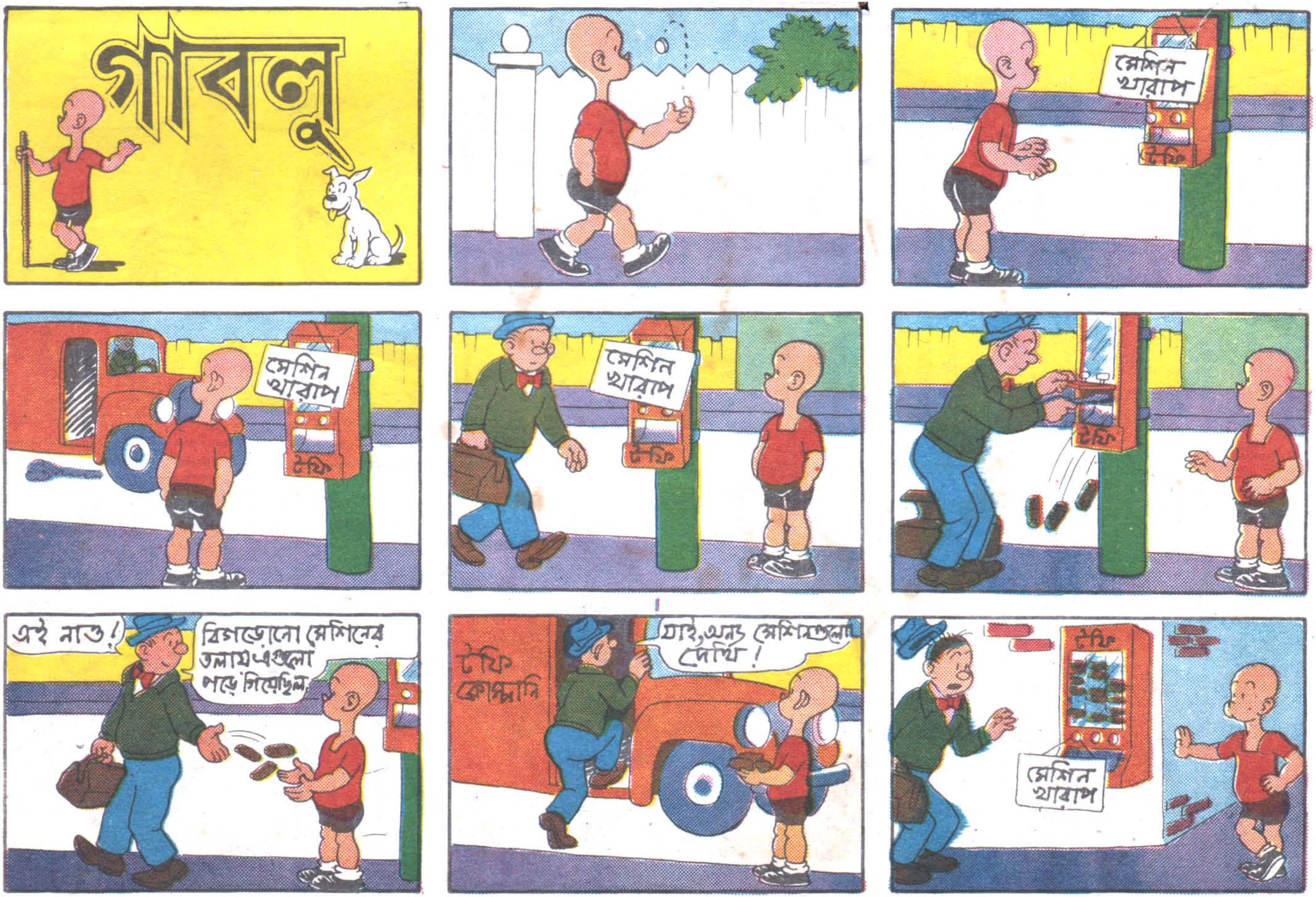
ক্লাস টেনের ফার্স্ট বয় শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কালীঘাটের সদানন্দ রোডে থাকে। বয়স ১৫ বছর। বাবা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করেন। শিবপ্রসাদ পঞ্চম শ্রেণী থেকে এই স্কুলে পড়ছে। দুটো সেকশনের মধ্যে প্রথম হয়ে ক্লাস টেনে উঠেছে। প্রদীপ মিত্র, ইন্দ্রজিৎ সিংহর সঙ্গে শিবপ্রসাদের প্রতিযোগিতা বেশি হয়। শিবপ্রসাদ সকালে তিন ঘণ্টা ও সন্ধেবেলা ঘণ্টা চারেক পড়ে। ছুটির দিন দুপুরে তিন ঘণ্টা অঙ্ক কষে। পড়া ও লেখায় প্রায় সমান সময় দেয়। স্কুলের মাস্টারমশাইরা পড়াশোনার ব্যাপারে খুব সাহায্য করেন তাকে। কী ভাবে উত্তর লিখতে হবে বলে দেন, উত্তর সংশোধন করে দেন। বাড়িতে অঙ্ক ও বিজ্ঞান পড়াবার জন্যে গৃহ-শিক্ষক আছেন। শিবপ্রসাদের দাদু পড়াশোনার ক্ষেত্রে তাকে খুবই সাহায্য করেন।

শিবপ্রসাদের বিজ্ঞান পড়তে সবচেয়ে ভাল লাগে, বড় হয়ে শিবপ্রসাদ ইঞ্জিনীয়ার হতে চায়। শিবপ্রসাদ ছবি আঁকতে ও ক্রিকেট খেলতে ভালবাসে। শিবপ্রসাদ পাক্ষিক আনন্দমেলার গ্রাহক। নিয়মিত পাক্ষিক আনন্দমেলা পড়ে। খেলাধুলার বিভাগ ও ধারাবাহিক উপন্যাসগুলো সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে তার।

প্রসঙ্গক্রমে শিবপ্রসাদ জানাল, সে ইংরেজিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল। সেইজন্যে সে যা পড়ে তা বেশি করে লিখতে চেষ্টা করে। বাংলা পাঠ্যপুস্তক পড়ার পরে টেস্ট পেপার্সের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখে। বইয়ের প্রশ্নমালার অঙ্ক কষে আগে, তারপর টেস্ট পেপার্সের সাহায্য নেয়। লাইফ সায়ান্স আগে ভাল করে বুঝে নিয়ে তারপর মুখস্থ করে। ফিজিক্যাল সায়ান্স ভাল করে বুঝে-বুঝে পড়ে। ভূগোল ও ইতিহাস ম্যাপ দেখে পড়ে প্রশ্নোত্তর লেখে।

সাধনা মুখোপাধ্যায়

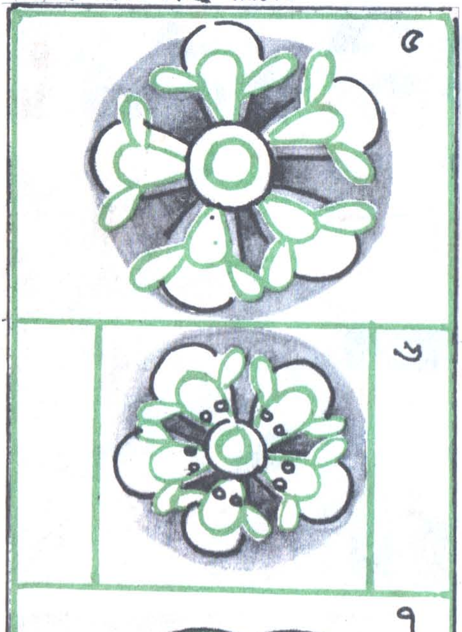

গাবলু


গাবলু
মেশিন খারাপ
টফি
মেশিন খারাপ
টফি
মেশিন খারাপ
টফি
টফি
এই নাও!
বিগড়োনো মেশিনের তলায় এগুলো পড়ে গিয়েছিল
টফি কোম্পানি
যাই, অন্য মেশিনগুলো দেখি!
টফি
মেশিন খারাপ

জন্তু-জানোয়ার-৪

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথমবারের নমুনায় লক্ষ করেছ কেমন ভাবে ধাপে ধাপে আকার তার নির্দিষ্ট রূপের দিকে এগিয়েছে। এবার গতবারের চার ধাপের সঙ্গে আরও তিন ধাপ যোগ হল। ফলে, ইঁদুররা কেমন দুধের বাটিতে মুখ দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছ। তোমরা চেষ্টা করলে আরও অনেক কিছু পারবে।



দোলনা পাখি-২

কারিগর

পাখির শরীরের জন্য কেটে রাখা গোল বোর্ডের মাঝামাঝি দাগ-মাফিক সমানভাবে ভাঁজ করে (১ নং ছবি) তার ওপর দিকে ঠিক মাপ বুঝে, একটুকরো বোর্ড ঢুকতে পারার মতো ফাঁক করে ত্যারছাভাবে কেটে নাও দু জায়গায় (চ+ছ ছবি)। কেটে রাখা লেজের (৩ নং ছবি) টুকরো নিয়ে যে-কোনো গোল জিনিসের (খ ছবি) গা পেঁচিয়ে চাপ দিয়ে নিলেই লেজের বাহার (৩ গ ছবি)। আর সেইভাবে মুখ-সমেত গলার বাঁকও পেয়ে যাবে (২ ঘ ছবি)। এবার এই তৈরি লেজ-মুখ-গলা নিয়ে শরীরের দুই অংশে কেটে রাখা জায়গায় (চ+ছ ছবি) বসিয়ে দিলেই দোলনা-পাখিকে দোল দিতে কোনো বাধা নেই, কেবল তার আগে কেটে রাখা পাখনাকে (৪ নং ছবি) পাখির গায়ে আঠা দিয়ে বসিয়ে চোখের জায়গায় পুঁতি বা চুমকি বসিয়ে শেষ করো।

জেনে রাখো—(১) গলা বা লেজ লাগানোর সময় আঠা ব্যবহার করলে কোনো সময়ে খুলে রাখা যাবে না।







রাম ও শ্যাম
আর অন্য গ্রহের বন্ধু
"জাগো রাম, আমার যে লাগে বড় ভয়, যা দেখলাম, এক দু:স্বপ্ন মনে হয়!"
অন্ধকার সুগভীর নিঝঝুম সেই রাতে কিম্ভুত এক জীব দেখা দিলো জানলাতে!
দু:জনেই ভাবছে করবে কি চিৎকার? সেই জীব ঘরে ঢুকে দিলো এক উপহার
"এটা যে মিউজিক্যাল বাক্স মনে হয়, গান ছাড়া এটা কি কথাও কি কয়?"
"এ তো বড় ভালো লোক যদিও ভয়ঙ্কর আমাদেরও কিছু দেওয়া উচিৎ, খুবই সুন্দর!"
"ঘড়ি টয়, রেডিও নাও খুশী ভরে কিন্তু দেখো ও যে সবেতেই মাথা নাড়ে!"
হঠাৎ রামের মাথায় বুদ্ধি এক খেললো যা পেলে আগন্তুক হবে উৎফুল্ল
"বিদায় বন্ধু! তোমায় আবার করি আবাহন, পপিন্সের জন্যে তোমার রইলো নিমন্ত্রন!"
খেতে ভাল
দেখতে ভাল
ভাবতে ভাল
পার্লে
পপিন্স
মিষ্টি ফলার পার্লে পপিন্স
PARLE POPPINS
৫ রকম ফলের স্বাদে ভরপুর রাসবেরী, আনারস, লেবু কমলালেবু ও মুসম্বী।